গল্পে উপদেশ

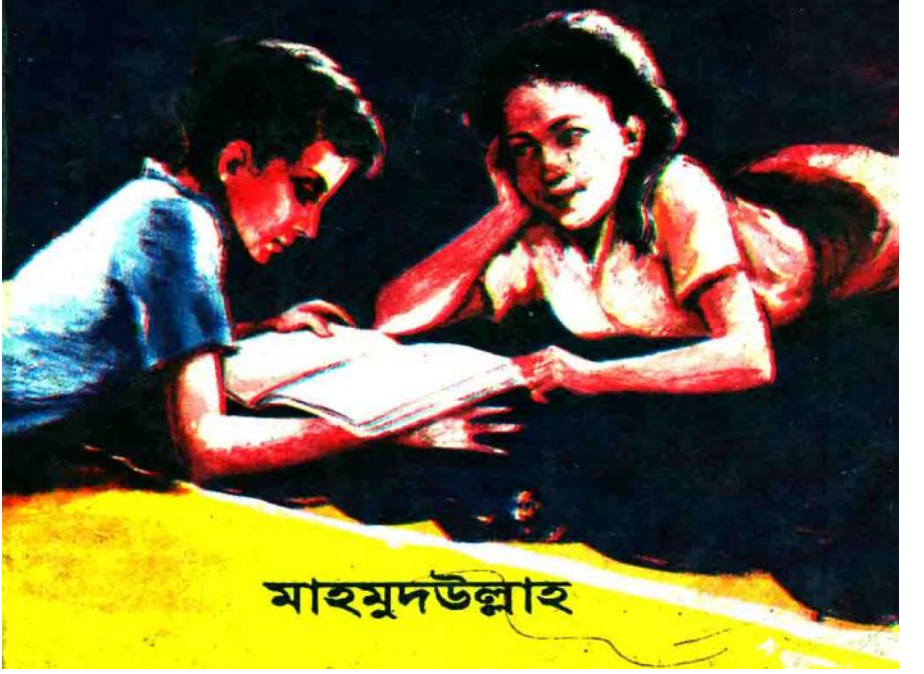

মাহমুদউল্লাহ

বাংলাদেশের সকল কিণ্ডারগার্টেন স্কুল, প্রাইমারী স্কুলে, পাঠ্যউপযোগী
এবং উপহারের সেরা গল্প গ্রন্থরূপে অনুমোদনযোগ্য।

গল্পে উপদেশ

(ছোটদের জন্য অনুপম উপদেশমূলক ২৫টি গল্প)

মাহমুদউল্লাহ
[ঢাকা সংস্কৃতি সংসদ কর্তৃক পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক]

সাহিত্যমালা ঢাকা

banglabooks.in

প্রকাশক
সাহিত্যমালা
৩৪/২, নর্থব্রুক হল রোড,
ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ-১৯৯২ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ-১৯৯৩ ইং
তৃতীয় প্রকাশ-১৯৯৪ ইং
চতুর্থ প্রকাশ—১৯৯৭ইং

স্বত্বঃ প্রকাশক কর্তক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ ও ছবি অংকনে
সুখেন দাস

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
সিকদার আবুল বাশার

মুদ্রণে
বর্ণনা কম্পিউটার
১২, নর্থব্রুক হল রোড
ঢাকা-১১০০

দাম
অফসেট কাগজে— ৮০ টাকা
সাদা কাগজে— ৬০ টাকা

banglabooks.in

কিছু কথা

উপদেশ হচ্ছে অনেকটা তেতো কুইনিনের মতো যা শুনে শিশুরা কেন, বড়োরাও আঁতকে উঠতে পারেন। সাদামাটা গলায় উপদেশ দিতে গিয়ে আপনিও সবার কাছে অপ্রিয়জন হয়ে উঠবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সরাসরি উপদেশ অনেকটা ভারী কণ্ঠে আদেশের মত। তাই যুগ যুগ ধরে মানুষ উপদেশ দিয়ে আসছে গল্পের ভেতর দিয়ে। ঈশপের গল্প এর একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাছাড়া, সারা পৃথিবী জুড়ে নানা পশু-পাখির গল্প আর রূপকথা উপকথায়ও ছড়িয়ে রয়েছে মূল্যবান উপদেশ।

সাহিত্যমালার স্বত্বাধিকারী শ্রী অরুণ কুমার দাস আমাকে যখন শিশুদের জন্য উপদেশমূলক একটি গল্পের বই লিখতে অনুরোধ জানালেন, আমি খানিকটা মুশকিলেই পড়ে গেলাম। মুশকিল এ জন্য যে, উপদেশের গল্প লিখবো, বিষয়বস্তু কি হবে। উপদেশের গল্প লিখতে গিয়ে বহুল প্রচলিত ঈশপের গল্প কিংবা রূপকথা-উপকথার পুনরাবৃত্তি করার আগ্রহ আমার মোটেই ছিলোনা। তাই এই গ্রন্থে বহুল প্রচলিত গল্প কিংবা রূপকথা উপকথার তেমন একটা আধিক্য নেই। যে দু'চারটা রূপকথা বা উপকথা দেয়া হয়েছে, পাঠকদের কাছে সেগুলো খুব একটা প্রচলিত রয়েছে বলে মনে হয় না। তাছাড়া একটি উল্লেখ করার মতো বিষয় থেকে উপদেশ না দিয়ে আমরা মানুষের জীবন থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারি। তাই এই গ্রন্থে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার ভালো-মন্দ দিক এবং শাসক-নেতা, কবি-সাহিত্যিক শিল্পী প্রভৃতি মনীষীদের জীবনের মহত্ব থেকেও বিস্তর উপদেশ নেয়া হয়েছে।

আর একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে, বইটি যেন পাঠকের কাছে কাঠখোট্টা উপদেশের একখানি সংকলন না হয়ে ওঠে। উপদেশ সামনে রেখে এই বইয়ে সরস গল্প সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। মনীষীদের জীবনভিত্তিক গল্পগুলো একদিকে যেমন বাস্তব, আরেকদিকে উপদেশমূলকও বটে।

আশা করি এই বই পড়ে শিশুরা গল্পের আনন্দ পাবে, জানার মতো অনেক বিষয় পাবে এবং সেইসঙ্গে পাবে হিরকখণ্ডের মতো সুন্দর একটি উপদেশ। সবিনয়ে বলবো, কেবল শিশুদের নয়, বড়োদেরও এই বই ভালো লাগবে।

— লেখক

banglabooks.in

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link

Get *More*
Free
eBook

VISIT
WEBSITE

www.banglabooks.in

Click here

উৎসর্গ

ফেরদৌস মাহমুদ

জাহিদ মাহমুদ

আমার দুই পুত্রকে

আব্বু-

সূচীপত্র

গল্পের নাম		পৃষ্ঠা
১। বুড়ো মানুষের মূল্য	...	৯
২। সততাই ধর্ম	...	১৫
৩। কৃপণের ধন	...	১৮
৪। শিয়াল ও সিংগাড়া	...	২৩
৫। বুদ্ধির জয়	...	২৬
৬। কলম ও তলোয়ার	...	৩১
৭। অত্যাচারী রাজা	...	৩৫
৮। যে সাগর মানে না বাধা	...	৩৯
৯। অভ্যাস যদি ভাল হয়	...	৪৫
১০। মহাকবি মহাপ্রাণ	...	৪৯
১১। আগে চাই কাজ	...	৫৫
১২। মানবদরদী কবি	...	৫৯
১৩। প্রকৃত সুখী	...	৬৫
১৪ বাংলার বাঘ	...	৭০
১৫। আজব দেশ	...	৭৪
১৬। দিল যার দরিয়া	...	৮০
১৭। বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি	...	৮৭
১৮। লোভী শিয়াল	...	৯২
১৯। মহানুভব কথাশিল্পী	...	৯৭
২০। শয়তানের পরাজয়	...	১০২
২১। যে কবি দুরন্ত পথিক	...	১০৬
২২। কল্পনায় বড়	...	১১১
২৩। ভাষার জন্যে ভালোবাসা	...	১১৩
২৪। একটি মিথ্যে কথা	...	১১৯
২৫। ভালবাসা সুরভিত প্রাণ	...	১২৬

বুড়ো মানুষের মূল্য

কোন এক দেশে অভাব অনটন লেগেই থাকতো। রাজা ভাবলো, দেশের মানুষ কমাতে হবে। তবেই অভাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। রাজা এক অদ্ভুত আইন জারি করলো, যে সব বুড়ো বাবা-মা কাজ করতে পারে না, কেবল শুয়ে বসে খায়, তাদেরকে বনে ফেলে আসতে হবে। কি আর করা যায়, আইন না মানলে যে প্রাণ যায়। তাই লোকজন তাদের বুড়ো বাবা-মাকে পাহাড়ের ধারে বনে ফেলে আসতো। বুড়ো-বুড়িরা সেখানে না খেয়ে মরতো, কিংবা যেতো বাঘের পেটে।

বুড়ো-বুড়িদের বনবাসে না পঠিয়ে উপায় ছিলনা। প্রহরীরা ঘুরে ঘুরে দেখতো কারা আইন অমান্য করেছে। বুড়ো-বুড়িকে বসিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে জানতে পারলেই, প্রহরীরা বাড়ির কর্তাকে ধরে নিয়ে যেতো। তার মাথাটা কেটে ফেলতো ঘ্যাচাং করে। বুড়ো-বুড়িকেতো বনবাসে পাঠাতোই।

একটি ছেলে তার বাপকে খুব ভালোবাসতো। বাপও তার ছেলেকে প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসতো। তবুও রাজার ভয়ে বাপকে বনবাসে যেতে হবে। কারণ সে কাজ করতে পারেনা। গায়ে শক্তি নেই, লাঠি ভর দিয়ে হাঁটে।

ছেলে কাঁদতে কাঁদতে বাপকে কাঁধে নিলো। তারপর চললো বনের দিকে। বাপের মনেও নানা চিন্তা। নিজে মরে গেলেও, ছেলে কেমন করে বেঁচে থাকবে--এই চিন্তায় তার কান্না পেলো। ছেলে হাঁটছে বাপকে কাঁধে নিয়ে। বাপ গাছের ছোট ডাল ভেঙে পথে ফেলছে। ছেলে যাতে ঠিকভাবে বাড়ি ফিরতে পারে, বাপ তাই ভাঙ্গা ডাল ফেলে পথের চিহ্ন রাখছে। পথেতো বাঘ ভালুকের অভাব নেই। ছেলের যদি

বিপদ ঘটে । বাপ ছেলের হাতে তুলে দিলো একটি কচি ডাল। বললোঃ বাবা, আমি সারা পথে এ রকম ডাল ফেলে এসেছি। তুমি সে সব ভাঙ্গা ডাল দেখে বাড়ি যেয়ো। অন্য পথে গেলে বাঘের কবলে পড়বে।

বাপ তাকে এত ভালবাসে--এ কথা ভাবতেই ছেলের আরো কান্না পেলো। সে থমকে দাঁড়ালো। বললোঃ বাবা, আমি তোমাকে ফেলে বাড়ি যাবো না। তোমাকে নিয়েই বাড়ি যাবো। আমি রাজার আইনকে ভয় পাই না।

বাপ বললোঃ বাবা, তোর যে ক্ষতি হবে।

ছেলে বললোঃ বাবা, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না।

ছেলের মনের জোর দেখে বাপ আর কিছু বলতে পরলোনা। ছেলের কাঁধে চড়ে বাড়ি ফিরে এলো।

ছেলে বাড়ির পেছনে একটা বড় গর্ত তৈরি করে বাপকে সেখানে লুকিয়ে রাখলো। পাড়ার লোকেরা যাতে জানতে না পারে, সে জন্য সে গোপনে বাপকে খাবার দিতে লাগলো।

ছেলে যা রোজগার করে, সামান্যই নিজে খায়। বাপ কেমন করে সুখে থাকবে, এই তার চিন্তা। সে বাপকে কোন দিন পোলাও কোরমা, কোন দিন দুধ ছানা খেতে দিলো। কোনদিন দূরের বাজার থেকে নিয়ে এলো আপেল আঙ্গুর। খেতে দিলো বাপকে। এ ভাবে ছেলের হৃদয়ের ছোঁয়া পেয়ে গুহার মধ্যে থেকেও বাপের মনে হলো, সে স্বর্গে বাস করছে।

একদিন রাজার ঢাকীরা ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা করলোঃ ছাই দিয়ে দড়ি বানাতে পারলে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেয়া হবে।

দেশের যত লোক শত চেষ্টা করেও ছাই দিয়ে দড়ি বানাতে পারলোনা।

ছেলে বাপের কাছে গিয়ে বললোঃ বাবা, রাজা ছাইয়ের দড়ি চেয়েছে। পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেবে। এই দড়ি কেমন করে বানানো যায়?

বাপ কতক্ষণ ভাবলো। তারপর বললোঃ একটা লম্বা কাঠের এ মাথা ও মাথায় একটা দড়ি টান করে বেঁধে নাও। তারপর দড়িটা পুরে ছাই করে ফেলো। দেখবে ছাইয়ের দড়ি হয়েছে।

ছেলে বাপের বুদ্ধিমত তাই করলো। সুন্দর পাকানো ছাই এর দড়ি হয়ে গেলো। ছেলে দেখালো রাজাকে। রাজা খুশী হয়ে গেলো। ছেলেকে পুরস্কার দিতে চাইলো। ছেলে বললোঃ মহারাজ, আপনার আশির্বাদই যথেষ্ট, আমি টাকা চাইনা।

কিছুদিন পর রাজার ঢাকীরা আবার ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করলোঃ রাজবাড়িতে দশ হাত লম্বা একটা কাঠ আছে। এই কাঠের কোন্‌টি আগা, কোনটি গোড়া যে বলতে পারবে, তাকে দেয়া হবে দশ হাজার টাকা পুরস্কার।

পুরস্কারের লোভে লাখ লাখ লোক গিয়ে হাজির হলো রাজবাড়িতে। সবাই দেখলো কাঠখানা। কেউ হাত দিয়ে ওজন করে দেখলো, কেউ টোকা দিয়ে দেখলো, কেউবা দেখলো গন্ধ শুঁকে। কেউবা বললো, এটা আগা, কেউবা বললো, ওটা গোড়া। কিন্তু কেউ প্রমাণ দিতে পারলোনা। রাজাও প্রমাণ না পেয়ে খুশী হলোনা।

ছেলে বাপকে খুলে বললো সব কথা। বাপ বললোঃ এটাতো সহজ বাবা। কাঠটা পানিতে নামিয়ে দাও। যে মাথা ডুবুডুবু দেখবে সেটাই গোড়া, যে মাথা উঁচু সেটা আগা।

বাপের বুদ্ধি নিয়ে ছেলে গেলো রাজবাড়িতে। গিয়ে দেখলো, লাখ লাখ লোক কাঠখানা নিয়ে টানাটানি করছে। কেউ বলছে, আমার কথা ঠিক, কেউবা বলছে, তোমার নয়, আমার কথা ঠিক। ছেলে রাজার লোকদের বললোঃ আসল

জবাব আমি দিতে পারি। প্রমাণও দিতে পরি। সবাই বল্‌লোঃ দেখাও দেখি কোন্‌টা আগা, কোনটা গোড়া।

ছেলে কাঠখানা নিয়ে দীঘির পানিতে ফেললো। কাঠের একদিক উঁচু, অন্যদিক নীচু দেখা গেলো। ছেলে সহজেই বলে দিলো কোনটি আগা আর কোনটি গোড়া। লাখ লাখ লোক বিস্মিত হলো।

রাজাতো মহাখুশী। রাজা ছেলেকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিতে চাইলো।

ছেলে বললো ঃ মহারাজ, আমি টাকা চাইনা। আপনার আশির্বাদই আমার পুরস্কার।

ছেলেটির লোভ নেই দেখে রাজা ভারী খুশী হলো।

আবার একদিন ঢাকীরা ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা করলোঃ এমন ঢোল কে বানাতে পারে, যা না বাজালেও বাজবে। যে বানাতে পারবে, তাকে বিশ হাজার টাকা পুরস্কার।

মোটা পুরস্কার। মেতে উঠলো সারা দেশ। হাজার হাজার ঢোল এলো রাজবাড়িতে। ঢোল এলো মোটা, লম্বা, খাটো, ঢাউস -- নানা রকমের। ঢোল যাতে বিনা বাজনায় বাজে, সে জন্যে ঢোলের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হলো নানা কলকাঠি। কিন্তু কারুর ঢোলই রাজার পছন্দ হল না। কারণ এসব ঢোল বিনা বাজনায়বাজেনা।

ছেলে বাপকে খুলে বললো সব কিছু। বাপ তাকে চামড়া কিনে আনতে বললো। গাছ থেকে মৌমাছিসহ চাক ভেঙ্গে আনতে বললো। ছেলে বাপের কথা মত কাজ করলো। বাপ মাটির ঢোল বানিয়ে তার মধ্যে হাজার হাজার মৌমাছি ঢুকিয়ে দিলো। চামড়া দিয়ে বন্ধ করে দিলো ঢোলের মুখ।

ছেলে ঢোল নিয়ে চুটে গেলো রাজবাড়িতে। রাজার হাতে ঢোল তুলে দিয়ে বললোঃ মহারাজ, এই আমার ঢোল নিন। বাজনা ছাড়াই বাজে।

আসলে হাজার হাজার মৌমাছি গুণ্ গুণ্ করে গান গাইছিল আর ঢোলের চামড়ায় আঘাত করছিল। তাই ভেতরে কেমন একটা ঝম্ ঝম্ শব্দ হচ্ছিল। শুনে মনে হলো, বিনা বাজনায় ঢোল বাজছে।

রাজা এই ঢোল দেখেতো মহাখুশী। সে ছেলকে চিনতে পারলো। ছেলেকে আগের পুরস্কারসহ চল্লিশ হাজার টাকা দিতে চাইলো। ছেলে তা নিতে চাইলোনা। বললোঃ আমি টাকা চাইনা। আপনার আশির্বাদই আমার পুরস্কার।

রাজা ছেলেটিকে কাছে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলোঃ তুমিতো পর পর তিনটি রহস্যের সমাধান দিলে। তুমি এত

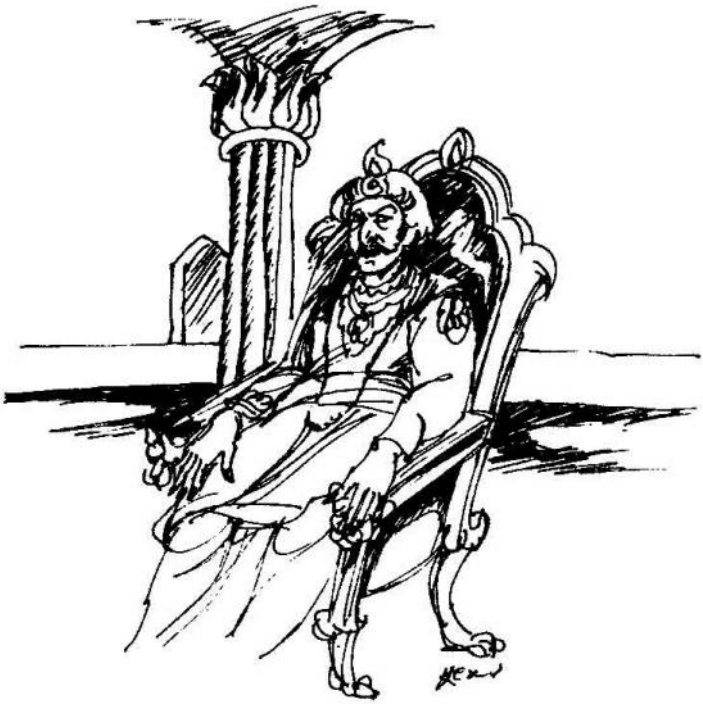

বুদ্ধি কোথায় পেলে?

ছেলে বললোঃ মহারাজ, আপনি অভয় দিলে বলতে পারি।

রাজা বললোঃ তুমি নিশ্চিন্তে বলতে পারো।

ছেলে বললোঃ তিনটি রহস্যেরই সমাধান দিয়েছেন আমার বাবা। তার কাছ থেকে বুদ্ধি নিয়েই আমি সমাধানগুলো আপনার কাছে হাজির করেছি।

ছেলে বাপকে বনবাসে না দিয়ে কি করে ফিরিয়ে আনলো, গুহায় রাখলো, সে কথা খুলে বললো রাজাকে।

রাজা একটুও রাগ করলোনা। বুঝতে পারলো, মানুষ বুড়ো হলে জ্ঞানী হয়। অনেক বুদ্ধির অধিকারী হয়। বুড়োদের জ্ঞানবুদ্ধি সমাজের উপকারে আসে। তারা না থাকলে সমাজ অচল হয়ে পড়ে।

রাজা এবার আইন জারি করলোঃ বুড়ো বাপ-মাকে বনবাসে পাঠালে গর্দান যাবে।

রাজা ছেলেকে দু' লাখ টাকা পুরস্কার দিলো। ছেলে তার বাপকে গুহা থেকে বের করে আনলো। মহা সুখে বসবাস করতে লাগলো। দেশের অন্যসব লোকও বুড়ো বাপ-মাকে নিয়ে নিশ্চিন্তে বসবাস করতে লাগলো। [জাপান]

সততাই ধর্ম

আমরা অনেকেই মনে মনে ভাবি দেশের কল্যান করবো, মানুষের উপকার করবো। কাজের বেলা দেখা যায়, নিজের আরামের জায়গাটি ছাড়তে চাইনা। খাওয়ার বেলা মাংসের বড় টুকরোটি, রুইমাছের মুড়োটি না হলে চলেনা। দশটি জামা থাকলেও আরো পাঁচটি চাই। নতুন নতুন বাহারের পোষাক চাই। আরো বাড়ি চাই, আরো জমি চাই। নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে আমরা অন্যের অধিকার ছিনিয়ে আনি। মানুষের উপকার না করে অপকার করে থাকি। আজ তোমাদের এমন একজনের কথা বলবো, যিনি বিলাসিতাতো দূরের কথা, স্বাভাবিক খরচ করতেও অনেক কিছু ভাবতেন।

উমাইয়া বংশের অষ্টম খলিফা। নাম তার ওমর ইবনে আবদুল আজিজ। তিনি ছিলেন খুবই ন্যায় পরায়ন। তিনি দ্বিতীয় ওমর নামে পরিচিত।

ঈদুল ফিতরের দিন। ঘরে ঘরে আনন্দের সাড়া পড়ে গেছে। মুসলমানরা ভাল ভাল পোষাক পরে দামেশ্‌ক নগরীর রাজপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শিশুরা ঝলমলে পোষাক পরে ছুটাছুটি করছে। খলিফা দ্বিতীয় ওমর নিজের কক্ষে আল্লাহর এবাদত করছেন। এমন সময় সেখানে ঢুকলেন তাঁর বেগম বিবি ফাতিমা। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন তাঁদের ছেলেরা। খলিফার ধ্যান ভেঙ্গে গেলো। তিনি বিবি ফাতিমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ কি হয়েছে, বেগম। ছেলেদের নিয়ে এখানে হাজির হলে যে!

বেগম বললেনঃ ছেলেরা কাল রাতে আমাকে ঘুমুতে দেয়নি। ওরা উজিরে আজমের বাড়িতে গিয়ে দেখে এসেছে, সে

বাড়িতে ছেলেদের জন্যে ঈদের জামা-কাপড় তৈরি করা হয়েছে। তাই দেখে ছেলেরা বায়না ধরেছে, তাদেরও অমন নতুন নতুন জামা-কাপড় কিনে দিতে হবে। অমি তাই ওদের আপনার কাছে নিয়ে এসেছি।

খলিফা নীরবে শুনলেন বেগমের কথা। তারপর জিজ্ঞেস করলেনঃ বেগম, ওদের কি পরার মত জামা-কাপড় নেই?

বেগম জবাব দিলেনঃ ওদের যে একবারেই পরার মত জামা কাপড় নেই তা নয়। তবে ওরা নতুন জামা- কাপড়ের জন্যে বায়নাধরেছে।

খলিফা বললেনঃ এখন আমার পক্ষে নতুন জামা-কাপড় কেনা একেবারেই সম্ভব নয়। আমি বায়তুল মাল থেকে দৈনিক মাত্র দুই দেরহাম পাই। আমি তার বেশী কি করে খরচ করতে পারি। এই সম্পত্তিতো আমার নয়।

বেগম বললেনঃ আপনার কাছে আরজ, আপনি আজকের দুই দেরহাম ও আগামীকালকের দুই দেরহাম--মোট চার দেরহাম বায়তুল মাল থেকে তুলে দিন। এখ্খুনি ছেলেদের জামা-কাপড়ের ব্যবস্থা করি।

খলিফা জবার দিলেন ঃ আগামীকালতো এখনও আসেনি, আজকের দিনটিও শেষ হয়ে যায় নি। তাই আমার পক্ষে বায়তুল মাল থেকে এক কপর্দকও তুলে আনা সম্ভব নয়। তুমি আমাকে এই অনুরোধ করোনা।

বেগম আবার বললেনঃ আপনিতো রাজাধিরাজ, রাজ্যের সর্বময় কর্তা। কিছু অর্থ গ্রহণের কি অধিকার আপনার নেই?

খলিফা জবাব দিলেনঃ আমি আমার দেশ ও মানুষের তত্ত্বাবধায়ক মাত্র। আমি দু'দিনের তত্ত্বাবধানের কাজ শেষ করেই কেবল দু'দিনের বেতন নিতে পারি। আমি অগ্রিম চার দেরহাম গ্রহণ করবো কেমন করে? আমি যে আজ থেকে দু'দিন বেঁচে থাকবো, তার নিশ্চয়তা আছে কি?

বেগম এ কথার পর আর কিছু বলতে পারলেন না। ছেলেদের নিয়ে নীরবে খলিফার কক্ষ ত্যাগ করলেন।

কৃপণের ধন

কৃপণের স্বভাব, টাকা থাকলেও ভাল কিছু খেতে পারে না। কাউকে ভাল কিছু খাওয়াতেও পারে না। পাওনাদারের পাওনাও মেটাতে পারে না। তাদের ভান্ডারে টাকা জমা হলেই তারা খুশী, কিন্তু খরচের বেলা কলজেটা ছিঁড়ে যায়। এ জন্যে কৃপণরা সমাজের অনেক সমস্যারও সৃষ্টি করে। তাদের দিয়ে ভাল কিছু আশাও করা যায় না। আজ এক কৃপণের গল্প বলবো।

অনেক কাল আগের কথা। তখন দিল্লীর সম্রাট ছিলেন কলিঙ্গ। দিল্লীতে বাস করতো কানাইলাল নামের এক কৃপণ বণিক। এই বণিকের ছিল অঢেল ধন দৌলত। তার সিন্দুকে থরে থরে সাজানো থাকতো মনি-মুক্তা, হিরা-জহরত, সোনা-রূপা। এত ধন দৌলত থাকলে কি হবে, তার বুকটা খাঁ খাঁ করতো। কেবল সে ভাবতো আরো ধন দৌলত কি করে উপার্জন করা যায়, সে কথা। আশে পাশে লোকজন না খেয়ে থাকলেও তার মন গলতোনা।

একদিনের ঘটনা বলি। সওদাপত্র বিক্রি করে কানাইলাল ঘরে ফিরলো। খাওয়া দাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে প্রথমেই সে বসে গেলো ধনদৌলতের হিসেব করতে। মোহরের থলেগুলো গুণতে গেয়ে দেখলো একটা খোয়া গেছে। আবার গুনলো, আশে পাশে দেখলো, সত্যি একটা থলে হারানো গেছে। কানাইলাল হায় হায় করে চিৎকার করে উঠলো। বুক

চাপড়াতে চাপড়াতে বললোঃ হায়রে, আমার মোহরের থলে কোথায় গেল।

কানাইলাল পাগলের মত ছুটে গেলো বাইরে। যে পথ দিয়ে এসছিল, সে পথে খুঁজলো থলেটা। দুঃখের বিষয় থলেটা খুঁজে পেল না। উপায় না দেখে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে ছুটে গেলো সম্রাট কলিঙ্গের কাছে। খুলে বললো সব কথা। সম্রাট কলিঙ্গ সব কিছু জেনে নিলেন কানাইলালের কাছে। তারপর তাকে প্রবোধ দিয়ে বললেনঃ দুঃখ করোনা, আমি তোমার হারানো থলে ফেরত পাওয়ার চেষ্টা করছি।

সম্রাট কলিঙ্গের আদেশে রাজ্যে ঢেঁড়া পিটিয়ে দেয়া হলো। বলা হলো, হারানো মোহরের থলেটা কেউ ফেরত দিলে তাকে পুরস্কার দেয়া হবে।

পথ চলতে চলতে এক বুড়ি পেয়েছিল সেই থলেটা। বুড়ি ছিল খুবই গরীব। পরনে তার তালি দেওয়া কাপড়। ক্ষুধায় কাতর হয়ে পথ চলতে তার কষ্ট হচ্ছিল। তা হলে কি হবে, পরের টাকার প্রতি একটুও তার লোভ হলোনা। চলতে চলতে বুড়ি ভাবছিল, হায়রে, যে লোকটা থলেটা হারিয়েছে, তার না জানি কি অবস্থা। এমন সময় সে শুনতে পেলো সম্রাটের লোকেরা ঢেঁড়া পিটিয়ে হারানো থলেটার খোঁজ করছে। বুড়ি চলে গেলো সম্রাট কলিঙ্গের দরবারে। মোহরের থলেটা ফিরিয়ে দিলো সম্রাটকে।

সম্রাট বুড়ির সাধুতা দেখে খুবই খুশী হলেন। বুড়ির জন্য তার খুব মায়া হলো। তিনি তার বিষয়-আশয়, পরিবার-পরিজনের খোঁজ নিলেন। জানতে পারলেন, বুড়ির আছে বিয়েরযোগ্য একটি মেয়ে। সম্রাট মনে মনে ভাবলেন, বুড়ির জন্য ভাল একটা কিছুকরতে হবে। তিনি বুড়িকে বললেনঃ তুমিতো ইচ্ছে করলে সব মোহরই নিতে পারতে। মেয়েটাকে

ভাল জায়গায় বিয়ে দিতে পারতে। তুমি তা করোনি। আমি তোমার সাধুতার জন্য তোমাকে পুরস্কার দেবো।

এমন সময় সম্রাটের দরবারে ছুটে এলো সেই কৃপণ বণিক--নাম যার কানাইলাল। সম্রাট তাকে অভয় দিয়ে বললেনঃ তোমার মোহর পাওয়া গেছে। এখন এই বুড়িকে পঞ্চাশটি মোহর দিয়ে দাও।

সম্রাট মোহরের থলেটা তুলে দিলেন কানাইলালের হাতে। কানাইলাল তার হারানো মোহরের থলে পেয়ে ভারী খুশী হলো। কিন্তু বেশিক্ষণ সে খুশী থাকতে পারলোনা। বুকটা ব্যথায় দুপ্ করে উঠলো। তাকে যে এখ্খুনি পঞ্চাশটি মোহর হারাতে হবে। তুলে দিতে হবে ওই ছেঁড়া কাপড় পরা গরীব বুড়িটার হাতে। কৃপন কানাইলাল কিছুতেই পঞ্চাশটি মোহর গরীব বুড়ির হাতে তুলে দিতে চাইলোনা। তার কলজেটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। কানাইলাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছু একটা ফন্দি আঁটলো। তারপর থলে থেকে মোহরগুলো ফেললো মাটিতে। ভাল করে গুণে দেখলো। চিৎকার করে কেঁদে বল্লো, মহারাজ আমার থলেতে যে ষাটটি মোহর কম রয়েছে।

নিশ্চয়ই ওই বুড়িটা আমার ষাটটি মোহর চুরি করেছে।

বুড়ি মনে মনে খুব আঘাত পেলো। সে ভাবলো, মানুষের উপকার করতে এসে বুড়ো বয়সে এই ছিল আমার ভাগ্যে! শেষ পর্যন্ত চুরির অপবাদ! আমি ইচ্ছে করলেতো সবটাই নিতে পারতাম।

সম্রাট সবই বুঝতে পারলেন। তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেলো, কানাইলাল কৃপন, লোভী--মিথ্যাবাদী। তাঁর মনে পড়ে গেলো, কানাইলাল তাকে জানিয়েছিল, থলেতে মাত্র পাঁচশ' মোহর রয়েছে। সম্রাট রাগ দমন করে কানাইলালকে জিজ্ঞেস করলেনঃ আগে তুমি ষাট মোহরের কথা বলোনি কেন?

কানাইলাল বললোঃ মনে ছিল না।

সম্রাট বললোঃ তা হলে এই থলে তোমার নয়। পাঁচশ' মোহর হারিয়েছে এমন দাবীদারও রয়েছে আমার দরবারে। সে আমার একজন ক্রীতদাস। তা হলে মোহরগুলো আমার ক্রীতদাসের। বলতে পারো আমারই। এখন আমার মোহরগুলো আমি যাকে খুশী তাকে দিতে পারবো।

সম্রাট মোহরের থলেটা তুলে দিলেন বুড়ির হাতে। বললেনঃ তুমি এই মোহরগুলো নিয়ে মেয়েটাকে ভাল বিয়ে দাও। ভালভাবে খাও দাও।

বুড়িতো পুরোটা থলে পেয়ে মহা খুশী। এখন এটাতো আর পরের ধন নয়, কিংবা নয় চুরি করা মোহর। স্বয়ং সম্রাট এটা দিয়েছেন।

সম্রাট বুড়ির হাতে মোহরের থলেটা তুলে দিয়ে কানাইলালের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ তুমি এখন যাও, তোমার পাঁচশ' ষাট মোহরের থলেটা যখন পাওয়া যাবে, ফেরত দেয়া হবে।

কৃপণ বণিক কিছু বলতে চাইলো। সম্রাট তাকে ধমক দিয়ে বললেনঃ এই মোহরের থলে তোমার নয়। ফের যদি চাও, তোমাকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে।

সম্রাটের সামনে আর কিছুই বলার সাহস পেলোনা কানাইলাল। প্রহরীরা তাকে দরবার থেকে বের করে দেলো। কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে পথ চললো সে। পাগলের মত বিড় বিড় করে বলতে থাকলো, হায়, এ আমি কি করলাম। থলেটা পেয়েও হারালাম স্বভাবের দোষে।

কৃপণের দশা এমনই হয়ে থাকে।

শিয়াল ও সিংগাড়া

একটি বিরাট পাহাড়। পাহাড়ের উঁচুতে ছিল একটি কুটির। সেখানে বাস করতো এক গেরস্থ আর তার বউ। একদিন গেরস্থের বউ তিনটি সিংগাড়া তৈরি করলো। একটি বড়ো, একটি মাঝারি আর একটি ছোট। তিনটি সিংগাড়া ভাল করে ভেজে গিন্নি সেগুলো রেখে দিলো জানালার ধারে মিটসেফের ওপর একটি বারকোশে।

তিনটি সিংগাড়ার মধ্যে ছোটটি ছিল খুবই চালাক। কড়াইয়ের কড়া ভাজায় তার মেজাজটাও হয়ে উঠেছিল তিরিক্ষি। গায়ের রংটা ছিল বাদামী। লোভনীয় ঘ্রাণ ছুটছিল তার শরীর থেকে। নিজের সৌন্দর্য ও সুঘ্রাণে নিজেই চমৎকৃত হলো সে।

সিংগাড়া মনে মনে ভাবলো, কি সুন্দর আমি! আমার রূপের কোন জুড়ি নেই। আমার পক্ষে বারকোশে শুয়ে থাকা এবং অচিরেই মানুষের পেটে যাওয়া উচিত নয়। নিশ্চয়ই আমার রূপ আর সৌন্দর্য নিয়ে বাইরে গেলে আমি যথেষ্ট সমাদর লাভ করতে পারবো। যেই না ভাবা সেই না কাজ।

সিংগাড়া এক লাফ মেরে জানালা গলিয়ে বাইরে নামলো। পাহাড়ের গা বেয়ে দ্রুত ছুটলো সে।

'হ্যা, খুব দ্রুত এসেছি। আমার কোন ত্রুটি হয়নি।' আনন্দে নেচে উঠলো তার মন। পাহাড়ের পাদদেশে আকাবাঁকা পথ বেয়ে খানিকটা এগিয়ে গেলো সে। সামনেই পড়লো একটা ছোট্ট নদী। নদীর ওপারে যাওয়ার কৌশল খুঁজলো সিংগাড়া। তখন পাশের পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল একটি শিয়াল। সিংগাড়া ভাবলো, ওকেই জিজ্ঞেস করা যাক না নদী পারাপারের কথা।

আগু পিছু না ভেবেই সিংগাড়া ডাকলো শিয়ালকে। বললোঃ শেয়াল ভাই, আমি নদীর ওপার যেতে চাই।

ধূর্ত শিয়াল খানিকটা কেশে পুরোপুরি ভালো মানুষের ভাব দেখালো। তারপর ভেবে চিন্তে বললোঃ এই অবেলায় কেমন করে যে ওপারে যাবে, ভেবে পাইনে। তবে লোকের ডাকেতো সাড়া না দিয়ে পারিনে। তুমি চাওতো, আমি পার করে দিই।

সিংগাড়া কি যেন একটু ভাবলো। তারপর বললোঃ আমিতো যেতেই চাই ভাই। কোন বিপদ হবে নাত।

'কিযে বলো বাপু, মানুষের উপকার করে করে বুড়ো হয়ে গেলাম। তুমি চাওতো এখ্খুনি পার করে দেই।' এক গাল হাসলো শিয়াল।

শিয়ালের কথায় রাজী হলো সিংগাড়া। বসলো গিয়ে শিয়ালের পিঠের ওপর। নদীপথে পাড়ি জমালো তারা। কিছুদূর গিয়ে শিয়াল তার শরীর খানিকটা ডুবিয়ে দিল। সিংগারা

বললোঃ বন্ধু তুমি আমার ঘাড়ে এসে বসো। এখানে খুব বেশী পানি। তাই শরীর ভিজে যাচ্ছে।

সিংগাড়া শিয়ালের কথায় তার ঘাড়ের ওপর গিয়ে বসলো। ভাবলো, যাক বাঁচা গেলো।

খানিকটা এগিয়ে শিয়াল করলো কি, তার ঘাড়ও পনিতে ডুবিয়ে দিলো। ভয় পেয়ে গেলো সিংগাড়া। শিয়াল বললোঃ এখানে পানি খুব বেশী, তাই ডুবে যাচ্ছি। তুমি আমার মাথার ওপর বসো।

সিংগাড়া শিয়ালের মাথায় গিয়ে বসলো। শিয়াল পথ চললো। নদীর বেশীর ভাগ পার হয়ে এলো তারা। এমন সময় শিয়াল তার নাক উঁচু করে মাথা ডুবিয়ে দিলো। আবার ভয় পেয়ে গেলো সিংগাড়া। শিয়াল তাকে অভয় দিয়ে বললোঃ এখানে আরো গভীর পনি। তুমি আমার নাকের ডগায় বসো। না হলে ডুবেযাবে।

সিংগাড়া নাকের ডগায় বসলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা নদীর কিনারে এসে গেলো। 'প্রিয় দোস্ত, এবারে তুমি আমার পেটে এসো'--এই বলে শিয়াল সিংগাড়াকে খপ্ করে কামড়ে ধরলো। নদীর কুলে এসে সিংগাড়ার আর কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না।

চাটুকরের কথায় পড়লে এভাবেই মরতে হয়।

[স্কটল্যান্ড]

বুদ্ধির জয়

তোমরা নিশ্চয়ই সম্রাট আকবরের নাম শুনে থাকবে। তাঁর সময়ে মোগল সাম্রাজ্যের সীমা যেমন বেড়ে যায়, তেমন বেড়ে যায় গৌরবও।

সম্রাট আকবর নয়জন গুণী ব্যক্তিকে নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন নবরত্ন সভা। এই নবরত্নের এক রত্ন ছিলেন রাজা বীরবল। তিনি ছিলেন যেমন পন্ডিত তেমনি জ্ঞানী গুনী। তবে তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি আর রসিকতার জন্যে।

রাজা বীরবল রসিক ছিলেন কিন্তু ভাঁড় ছিলেন না। তাঁর রসিকতার মধ্যে এমন সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যেতো, যা সম্রাট আকবরের মত বিশাল ব্যক্তিকেও তাক লাগিয়ে দিতো। সম্রাট আকবরও না হেসে পারতেন না। বীরবলের অসাধারণ বুদ্ধির জন্যে সম্রাট তাঁকে ভালবাসতেন।

একবার সম্রাট আকবর দরবারে সভাসদদের প্রশ্ন করলেনঃ আপনারা বলুনতো আমার সাম্রাজ্যে সবচেয়ে কোন পেশার লোক বেশী?

আমীরগণ একে একে জবাব দিলেন। কেউ বললেন, কৃষক বেশী, কেউ বললেন সৈনিক বেশী আর কেউবা বললেন, শ্রমিক বেশী। বীরবল তখনও কিছুই বললেন না।

সম্রাট আকবর বীরবলকে বললেনঃ এবারে আপনি জবাব দিন।

বীরবল তমিজের সঙ্গে বললেনঃ শাহানশাহ্, আপনার রাজ্যে চিকিৎসকের সংখ্যাই বেশী।

সম্রাট বিস্মিত হলেন। উত্তরটি তাঁর কাছে সঠিক মনে হলোনা। তিনি বললেনঃ এ আপনি কি বলছেন! সারা দেশে

ক'জনইবা চিকিৎসক আছে। চিকিৎসার অভাবে হর হামেশা লোক ম'রছে। আর আপনি বলছেন চিকিৎসকের সংখ্যাই বেশী! আপনাকে এ কথার প্রমান দিতে হবে।

বীরবলের প্রাধান্য দেখে অন্যান্য আমীর ওমরাহ তাঁকে হিংসা করতেন। তাঁরা ভাবলেন, এবারে একটা ভুল উত্তর দিয়ে বীরবল হেরে গেলেন। বুঝিবা সম্রাটের অপ্রিয় হলেন। তাঁরা মনে মনে খুশীই হলেন।

বীরবল একটু গুছিয়ে নিয়ে জবাব দিলেনঃ জাঁহাপনা, প্রমান আপনি এখ্খুনি পেতে পারেন। আপনি একবার কেবল বলুন, আপনার একটু সর্দি হয়েছে, তবেই প্রমান মিলবে।

সম্রাট বললেনঃ সে কেমন করে?

অমনি বীরবল জবাব দিলেনঃ জাঁহাপনা, আপনি যখনই আপনার রোগের কথাটি প্রকাশ করবেন, অমনি চারদিক থেকে লোকজন চিকিৎসার ব্যবস্থা দিতে শুরু করবে। কেউ বলবে, এটা খান, কেউ বলবে, ওটা মালিশ দিন। তাহলে ভেবে দেখুনতো চিকিৎসকের সংখ্যাই কি দেশে বেশী নয়।

সম্রাট হেসে উঠলেন। বীরবলের তারিফ করে বললেনঃ বীরবল ঠিক কথাই বলেছেন। তাঁর বুদ্ধির জুড়ি নেই।

সম্রাটের কাছে বীরবলের সমাদর বেড়েই যেতে লাগলো। অন্যান্য সভাসদ বীরবলের এই সম্মান ও সমাদর মেনে নিতে পারলেন না। তাঁরা ভাবলেন, যে করেই হোক বীরবলকে সম্রাটের সামনে অপদস্থ করতে হবে। তাঁরা একদিন সম্রাটের কাছে আবেদন জানালেন, বীরবলকে বুদ্ধির পরীক্ষা দিতে হবে। তিনজন পন্ডিত দরবারে বসে কি ভাবছেন, বীরবলকে তার উত্তর দিতে হবে। যদি তিনি উত্তর দিতে না পারেন, তাহলে তিনি দরবার থেকে চিরতরে বিদায় নেবেন।

বীরবল কথাটা শুনেই রাজী হয়ে গেলেন। সম্রাট আকবর কিন্তু এ ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে বারণ করলেন বীরবলকে। তাঁর মনে ভয় ছিল, যদি হেরে যান, বীরবলকে দরবার ছাড়তে হবে চিরতরে। বীরবল কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামলেন।

দরবারে পন্ডিতদের সঙ্গে শুরু হলো লড়াই। প্রথম পন্ডিত বীরবলকে জিজ্ঞেস করলেনঃ বলুনতো, আমি এখন কি ভাবছি?

বীরবল জবাব দিলেনঃ আপনি ভাবছেন, সম্রাট আকবর দীর্ঘজীবী হোন।

সম্রাট আকবর পন্ডিতকে জিজ্ঞেস করলেনঃ বীরবলের কথা সত্যি কিনা, বলুন।

পন্ডিত 'না' বলতেও পারলেন না। অগত্যাবলতেই হলোঃ জাঁহাপনা আমি আপনার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

আর কি, প্রথম প্রশ্নের উত্তর সঠিক হয়ে গেলো। দরবারে পড়ে গেলো হৈ চৈ।

এবারে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর। দ্বিতীয় পন্ডিত বীরবলকে প্রশ্ন করলেনঃ আচ্ছা বলুনতো, আমি কি ভাবছি?

বীরবল চোখ বুঁজে কি সব ভাবলেন, চিন্তার ভাব দেখালেন, নানা ভনিতা করলেন--তারপর জবাব দিলেনঃ আপনি চান মাননীয় সম্রাটের শান শওকত; আর চান আমীর ওমরাহ পাত্র মিত্র যেন সম্রাটের দরবারে চিরদিন বহাল থাকতে পারেন। কী ঠিক বলিনি!

সম্রাট আকবর নিজেই পন্ডিতকে জিজ্ঞেস করলেনঃ কী--আপনি আমার শান শওকত চান না! আপনি চাননা সবাই চিরস্থায়ী হোক। আপনি তাই ভাবছেন না?

অগত্যা দ্বিতীয় পন্ডিত জবাব দিলেনঃ জাঁহাপনা, আমি তাই ভাবছি।

আবার দরবারে হৈ চৈ পড়ে গেলো।

এবারে তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বীরবলকে তৃতীয় পন্ডিত প্রশ্ন করলেনঃ বলুনতো, রাজা বীরবল, প্রতিদিন সকালে আমি একটি চিন্তা করি, সেই চিন্তাটি কি?

রাজা বীরবল কতক্ষণ চুপ থাকলেন। এমন একটা ভাব দেখালেন, যেন মহা মুস্কিলে পড়ে গেছেন। তারপর তালপাতায় আঁক কষলেন। চোখ বুঁজে কিছুক্ষণ ভাবলেন অনেককিছু। হঠাৎ খুশীতে হেসে উঠলেন তিনি। তারপর বললেনঃ পন্ডিত প্রবর, সত্যি আপনি মহামান্য সম্রাটের হিতাকাঙ্খী। বলা য়ায় প্রকৃত সভাসদ। আপনি প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই চিন্তা করেন, আমাদের সম্রাট নতুন,

একটা রাজ্য জয় করেছেন--এমন একটা খবর আসুক। কেমন, ঠিক বলিনি?

তৃতীয় পন্ডিত এক কথায় স্বীকার করলেন, আমি রোজ সকালে তাই চিন্তা করি।

তুমুল হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়লো সারাটা দরবার। বীরবলের তৃতীয় জবাবও ঠিক হয়েছে। স্বয়ং সম্রাট সিংহাসন থেকে নেমে এসে বীরবলের সঙ্গে আলিঙ্গন করলেন। আবার বসলেন সিংহাসনে। শান্তকন্ঠে বললেনঃ বীরবল অমাদের মধ্যে সত্যিকারের গুণীজন, আমরা তার মত প্রতিভাবান ব্যক্তিকে পেয়েধন্য।

সত্যি, বীরবলের কদর সেদিন থেকে আরো বেড়ে গেলো। কেবলই উপস্থিত বুদ্ধির জোরে।

বুদ্ধি মানুষকে অনেক বড় করতে পারে।

কলম ও তলোয়ার

বিকেল বেলা রাহুল ও রাতুলের মধ্যে একটি তর্ক চলছিল। তর্কের বিষয় অসি আর মসি অর্থাৎ তলোয়ার আর কলম। রাহুল বলছিল তলোয়ার বড়। রাতুল বলছিল কলম বড়।

রাহুল তলোয়ার ধরার ভঙ্গীতে হাত ঘুরিয়ে বলছিলঃ তলোয়ার দিয়ে এক কোপে তোর মাথা কেটে দেবো। তুই কলম দিয়ে ঠেকাতে পারবি?

ছোট মেয়ে রাতুল ভাইয়ের এই আচরণে কেঁদেকেটে বললোঃ তুমি আমাকে অপমান করলে? করবেইতো। কলমকে যারা ছোট করে দেখে, তারা আবার মানুষের মূল্য দেবে কেমন করে?

দুই ভাই-বোনের তর্কের কিছুটা আমি শুনে ফেলেছিলাম। ঘরে ঢুকতেই ওরা আমাকে ছেঁকে ধরলো। দু'জনই প্রায় এক সঙ্গে প্রশ্ন করলোঃ কলম বড় না তলোয়ার বড়, বাবা।

আমি কোন পক্ষেই রায় দিলাম না। আমি কেবল একটি গল্প বল্‌লাম। সেই গল্পটি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি।

মোগল বাদশাহ শাহজাহান ছিলেন তখন দিল্লীর সম্রাট।

সম্রাটের একটি দপ্তর ছিল, সেখানে সৈনিকদের মাইনে দেয়া হতো। যে লোকটি মাইনে দিতো তাকে বলা হতো মুন্সি। সেদিন মুন্সি দপ্তরের কাজে খুব ব্যস্ত ছিল। এমন সময় ঝড়ের মতো এসে হাজির হলো একজন সৈনিক। কি একটা কারণে মাইনে নিতে তার দেরী হয়ে গিয়েছিল। সৈনিকটি ভেতরে ঢুকেই চড়া কণ্ঠে বললোঃ আমার মাইনেটা চুকিয়ে দাওতো।

মুন্সি বল্‌লোঃ আমার হাতের কাজটা সেরেই তোমার

মাইনে দিচ্ছি।

সৈনিক এবারে আরো রেগে বল্‌লোঃ জলদি করো। আমার বসার সময় নেই।

মুন্সি তখন হিসাব মিলাচ্ছিল। অন্য কাজে মন দেবার একদম সুযোগ ছিলনা তার। সে বললোঃ একটু বসতেই হবে তোমাকে। হাতের কাজটা শেষ না করে আমি মাইনে দিতে পারবোনা।

মিলিটারী মেজাজে সৈনিক এবারে বললোঃ কি বললে? আমার মাইনে দেবে না? আমার মাইনে আটকে রাখবে?

মুন্সি বল্‌লোঃ মাইনে দেবোনা এমন কথাতো বলিনি। বলেছি একটু বসতে হবে।

সৈনিক তার তলোয়ারটি বাড়িয়ে ধরে বললোঃ এখ্‌খুনি আমার মাইনে দাও। তা না হলে তোমার সামনের দু'টি দাঁত তুলে ফেলবো।

মুন্সি কলম ওপরে তুলে ধরে বল্‌লোঃ কি বল্‌লে? আমার দাঁত খুলে ফেলবে? আমার হাতেও কলম আছে। ভেবোনা আমি দুর্বল। আমিও কলম দিয়ে কিছু করতে পারি। সৈনিক মুন্সির কথায় গ্রাহ্য না করে বললোঃ কলম দিয়ে করবে কচু। দাও, এখন আমার মাইনেটা দিয়ে দাও।

মাইনে চুকিয়ে দিলো মুন্সি। সৈনিক চলে যেতে যেতে বললোঃ আমাকে ভয় দেখিওনা বাপু। তোমার কলমের চেয়ে আমার তলোয়ার অনেক বড়।

মুন্সি সৈনিকের আচরণে মনে বড় ব্যথা পেলো। মনে মনে বুদ্ধি আঁটিলো, কেমন করে সৈনিককে শায়েস্তা করা যায়। হঠাৎ একটা বিষয় তার মনে পড়লো। তখনকার দিনে সৈনিকদের বেতন নিতে হলে শরীরের একটি চিহ্ন দেখাতে হতো। আগেই চিহ্নটির কথা বেতনের খাতায় লেখা থাকতো। মুন্সির মাথায় বুদ্ধি খেলে গেলো। সে মাইনের খাতায় শরীরের চিহ্নের ঘরে লিখে রাখলো, সৈনিকটির সামনের দুটি দাঁতনেই।

এক মাস পরের কথা। মুন্সি বেতনের টেবিল থেকে সরে গিয়ে অন্য জায়গায় বসলো। বেতনের টেবিলে বসলো অন্য একজন লোক। সেই সৈন্যটি এলো মাইনে নিতে। বেতনের কর্মচারী খাতা খুলে সৈনিককে জিজ্ঞেস করলোঃ কি নাম আপনার?

সৈন্য নাম বললো।

কর্মচারী জিজ্ঞেস করলোঃ আপনার বাবার নাম কি? সৈন্য তার বাপের নাম বললো।

কর্মচারী বললোঃ দেখি, আপনার দাঁতের পাটি দেখান তো!

সৈন্য বললোঃ কেন?

কর্মচারী বল্‌লোঃ খাতায় লেখা আছে আপনার সামনের

দু'টি দাঁত নেই।

সৈন্য বললোঃ নাতো! আমার চিহ্নতো এই কাটা আঙ্গুলটা।

কর্মচারী বললোঃ না, খাতায় যা লেখা আছে, তাই মানতে হবে। তানা হলে আপনি মাইনে পাবেন না।

সেন্যটি আর রাগ করতে পারলো না। মাইনে না তুল্‌লেও চলেনা। সে দেরী না করে হেকিমের কাছে চলে গেলো। হেকিম তার সামনের দু'টি দাঁত তুলে ফেললো। সৈন্যটি রক্তমাখা মুখে রুমাল চেপে ধরে আবার হাজির হলো দপ্তরে। মাইনে নিয়ে বাড়ি যাওয়ার সময় সে দেখতে পেলো দপ্তরের

মুন্সিকে। মুচকি হাসছে তার দিকে তাকিয়ে। সৈন্যটি মুন্সিকে বললোঃ সত্যি, কলমের জোরই বেশী। আমি আর কোন দিন তলোয়ারের বাহাদুরী দেখিয়ে বেয়াদবী করবোনা। সালাম মুন্সি।

আমার এই গল্প শুনে রাতুল ভারী খুশী হলো। রাহুল সেই সৈনিকের মত সুর্ সুর্ করে অন্য জায়গায় চলে গেলো। আর গল্পটি পড়ে তোমরা কি উপদেশ পেলে নিজেরাই ভেবে দেখ।

অত্যাচারী রাজা

এক রাজার গল্প শোনো। সে ছিল ভরী অত্যাচারী। সে চাইতো, সে যা বলবে, সবাই তা মেনে নেবে। 'জি হুজুর' বলে তাকে সমর্থন করবে। সে চাইতো, সে দিনকে রাত বলবে, রাতকে বলবে দিন--অমনি মন্ত্রী আর পারিষদরা বলবে, ঠিক হুজুর, ঠিক। সে চাইতো প্রজারা তার নাম শুনেই মাথা নত করবে।

রাজার কথা সব সময়ই মেনে নেয়া সম্ভব হতোনা প্রজাদের। যেমন, একবার রাজা প্রজাদের আদেশ করলো, তোমাদের দ্বিগুণ খাজনা দিতে হবে। শুনেই প্রজাদের আর্তনাদ শুরু হয়ে গেলো। অনেকের পক্ষেই দ্বিগুণ খাজনা দেয়া সম্ভব হলোনা। রাজার কোটালরা এসে ধরে নিয়ে গেল তাদের। পাইকারী হারে মৃত্যুদন্ড দেয়া হলো। রাজ্যের বহুলোক প্রাণ হারালো।

রাজার অত্যাচারে কেবল যে প্রজা মারা যেতো তা নয়; মন্ত্রী, অমাত্য এবং রাজকর্মচারীদেরও নিস্তার ছিলনা। একজন মন্ত্রী হয়তো মনের ভুলে একটি সত্য কথা বলে ফেললো, রাজার তা পছন্দ হলোনা, অমনি সে তার প্রাণদন্ড দিলো। কারণে অকারণে মন্ত্রী, অমাত্য আর রাজকর্মচারীদের মৃত্যুদন্ড চলতে থাকলো রাজার হুকুমে। ফলে দরবারে মন্ত্রী, অমাত্য আর রাজকর্মচারীদের সংখ্যা কমতে লাগলো। শেষে এমন হলো যে, রাজদরবার অচল হয়ে পড়লো। সব চেয়ে সংকট দেখা দিলো মন্ত্রীর অভাবে। রাজা ঘোষণা দিলো, মন্ত্রী চাই, মন্ত্রী নিয়োগ করা হবে। কিন্তু ভয়ে কেউ মন্ত্রী হবার

জন্যে এগিয়ে এলোনা। রাজা প্রহরী পাঠিয়ে দিলো মন্ত্রী খুঁজে আনারজন্যে।

ঘোড়া নিয়ে সারা রাজ্যে ঘুরতে লাগলো প্রহরীরা। রাজার ঘোষণা যে শোনে, সে–ই পালিয়ে যায়। কেউ মন্ত্রী হতে চায় না। প্রহরীরা পড়ে গেলো মহা বিপদে। মন্ত্রী নিয়ে রাজার কাছে ফিরে যেতে না পারলে তাদের যে গর্দান যাবে। প্রহরীদের দেখে সবাই যখন সরে যাচ্ছিল, তখন পাওয়া গেলো একটি লোককে। প্রহরীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। লোকটাকে বললো, ভাই, রাজা তোমাকে মন্ত্রী বানাতে চান। এখ্খুনি চলো।

লোকটা ছিল মাতাল। সে প্রহরীদের কথায় রাজী হয়ে গেলো। জিজ্ঞেস করলো, আমাকে কি করতে হবে? প্রহরীরা বললো, রাজার সব কথায় কেবল 'জ্বি হুজুর' বললেই চলবে। লোকটি ছিল জাতে মাতাল, তালে ঠিক। সে প্রহরীদের কথায় সায় দিয়ে বললো, তা পারবো।

প্রহরীরাও প্রাণে বেঁচে গেলো।

নতুন মন্ত্রী পেয়ে রাজাতো ভারী খুশী। এমন অনুগত মন্ত্রী তার একটিও জোটেনি। কিছু না বলতেই সে জবাব দেয়, জ্বি হুজুর, ঠিক হুজুর। আগের মন্ত্রীরা রাজার প্রশ্ন শুনে কিছু একটা ভেবে চিন্তে কথা বলতো। নতুন মন্ত্রী ভাবনা চিন্তার ধার ধারে না। সোজা বলে বসে, জ্বি হুজুর, ঠিক হুজুর। রাজা ভাবলো, আহ্, এমন না হলে কি চলে!

কিছুদিনের মধ্যেই রাজা বিগড়ে গেলো। মানুষ হত্যার ইচ্ছেটা আবার চাড়া দিয়ে উঠলো তার মাথায়। মন্ত্রীকে হত্যা করার ছুঁতো খুঁজতে লাগলো সে। রাজা একদিন বললো ঃ চলো মন্ত্রী, আমরা কোথাও থেকে ঘুরে আসি। মন্ত্রী বললো, জ্বি হুজুর, ঠিক হুজুর।

রাজা আর মন্ত্রী ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বের হলো। লোকজন যে যেখানে ছিল ভয়ে পালালো। কি জানি, পাগলা রাজা আর মাতাল মন্ত্রী কোন্ অঘটন ঘটিয়ে বসে।

দরবারের বাইরে এসে রাজা ভারী আনন্দ পেলো। মন্ত্রীকে বললো ঃ চলো আমরা আরো সামনে এগিয়ে যাই।

সামনে খোলা মাঠ, মাথার ওপর উন্মুক্ত আকাশ -- বেড়াবার খুব সখ হলো রাজার। ঘোড়া ছুটিয়ে উঁচু-নিচু পথ পেরিয়ে তারা এলো একটা বিশাল প্রান্তরে। এক পাশে সবুজ বন। বনের ধার ঘেঁষে বিরাট একটি দীঘি। এতক্ষণ পথ চলতে চলতে রোদের তাপে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল রাজা। দীঘির টলটলে জল দেখে তার ইচ্ছে করলো গোসল করতে। অমনি সে মন্ত্রীকে বললো ঃ আমি গোসল করবো। তুমি জিনিসপত্র পাহাড়া দাও। মন্ত্রী বললো, জ্বি হুজুর, ঠিক হুজুর।

রাজা মুকুট খুললো । সব পোষাক খুললো। নাইতে নামলো দীঘিতে। ঠাণ্ডা পানিতে শরীরটা জুড়িয়ে গেলো তার। আরাম পেযে আরো সামনে এগিয়ে গেলো সে। তার খেয়ালও রইলো না যে, সে সাঁতার জানেনা। সামনে এগিয়ে যেতে যেতে গভীর পানিতে ডুবে যেতে লাগলো রাজা। অমনি সে চিৎকার দিয়ে মন্ত্রীকে ডাকলোঃ বাঁচাও -- বাঁচাও।

মন্ত্রী বললো, জ্বি হুজুর, ঠিক হুজুর।

সে একটুও নড়লো না। রাজাকে উদ্ধার করার নামও নিলো না। দাঁড়িয়ে থেকে কেবল

বললো, জ্বি হুজুর, ঠিক হুজুর।

এদিকে রাজা দাপাদাপি করতে করতে গভীর পানিতে ডুবে গেলো। মারা গেলো কিছুক্ষণের মধ্যেই।

মন্ত্রী আর কি করে। রাজার মুকুট পরলো। পোষাক পরলো। ফিরে এলো রাজধানীতে। সবাইকে জানিয়ে দিলো, এখন থেকে আমিই রাজা।

নতুন রাজা পেয়ে প্রজারা খুশি না হলেও অত্যাচারী রাজার মৃত্যুতে স্বস্তি পেলো। তারা খুশি হলো।

অত্যাচারী রাজার পরিণাম এমনই হয়ে থাকে।

(শ্রীলংকা)

সাগর মানেনা বাধা

একটি শিশুর জন্ম হলো। শিশুটির বাবা গেছেন হাটে। পিতামহ আছেন বাড়িতে। সুখবরটা দেয়ার জন্যে–পিতামহ ছুটলেন হাটের দিকে। পথেই ছেলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। তিনি রসিকতা করে ছেলেকে বল্‌লেন ঃ ওহে ঠাকুর দাস, আমাদের একটি এঁড়ে বাছুর হয়েছে।

বলে নিতে হয়, শিশুটির বাবার নাম ঠাকুর দাস। পিতামহের নাম রামজয়।

রামজয়ের রসিকতা বুঝতে পারেননি পুত্র ঠাকুর দাস। তিনি ভেবেছিলেন, সত্যি তাদের গাভীটির একটি এঁড়ে বাছুর হয়েছে। তিনি বাড়িতে এসে প্রথম ছুটলেন গোয়াল ঘরের দিকে। আগেই জানতেন তাদের গাইটা বিয়োবে। তিনি গোয়াল ঘরে গিয়ে বাছুর খুঁজতে লাগলেন। এমন সময়

রসিক রামজয় পুত্রকে ডেকে বললেন ঃ বাছুর দেখতে হলে এদিকে এসো। ওদিকে নয়।

পুত্রকে রামজয় সুতিকা ঘরের দিকে নিয়ে গেলেন। বললেনঃ ওই যে দেখো, তোমার এঁড়ে বাছুর।

ঠাকুর দাস তাঁর স্ত্রী ভগবতীদেবীর কোলে একটি ফুটফুটে শিশু দেখতে পেলেন। এবার বুঝতে পারলেন তাঁর বাবা কাকে এঁড়ে বাছুর বলেছেন।

রামজয়ের কথা মিথ্যে হয়নি। তাঁর আদরের নাতিটি ছিলেন এঁড়ে বাছুরের মত একগুঁয়ে। তিনি একবার যা বলতেন, তাই করে ছাড়তেন। এই শিশুটিকে তোমরা কি কেউ চিনতে পেরেছ?

তাঁর নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামেই তিনি সবার কাছে পরিচিত। তিনি যেমন বিদ্যার

সাগর -- তেমন দয়ারও সাগর। তাই তাঁকে দয়ার সাগরও বলা হয়।

আগেই বলেছি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন এঁড়ে বাছুরের মতই একগুঁয়ে। তিনি যা করবেন বলে ঠিক করতেন, তা অবশ্যই করে ছাড়তেন। কোন বাধাই তাকে দমিয়ে রাখতে পারতো না। সেই ঘটানাটি কারোরই অজানা নয়, তিনি নদী সাঁতরে মাকে দেখতে গিয়েছিলেন।

তিনি নিজের প্রতিজ্ঞায় ছিলেন অটল, অবিচল। তাই দারুণ অভাব অনটনের মধ্যেও লেখা পড়া শিখে এত বড় হতে পেরেছিলেন।

ছেলেবেলায় ঈশ্বরচন্দ্র কোলকাতায় যে বাড়িতে থাকতেন, সেখানে তাকে কয়েকজনের জন্যে রান্না করতে হতো। এমন কি এঁটো বাসনও মাজতে হতো। কাজের ঝামেলা শেষ হলে ক্লাশের পড়া শুরু করতেন। রাত জেগে পড়তেন তিনি।

অন্যরা হলে লেখাপড়া হয়তো ছেড়েই দিতো। যে কোন বাধা জয় করার ক্ষমতা ছিল বিদ্যাসাগরের। তাই তিনি পড়া বন্ধ করলেন না। তিনি ক্লাশে বরাবর প্রথম হতেন। অনেক ভাল ফল করে পাশ করতেন।

নিজের প্রতিভা বলে ঈশ্বরচন্দ্র হয়েছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। একইসঙ্গে বিদ্যালয়ের বিশেষ পরিদর্শকও ছিলেন তিনি। অধ্যক্ষ হিসেবে মাইনে পেতেন তিনশ' টাকা আর বিশেষ পরিদর্শক হিসেবে দু'শ' টাকা। মোট পাঁচশ' টাকা মাইনে পেতেন তিনি। তখনকার দিনে পাঁচশ' টাকা বেতন মানে বিরাট ব্যাপার। রাজার হালে দিন কাটাতে পারতেন তিনি। বিদ্যাসাগর কিন্তু তা করলেন না। দেশের জন্যে মন কেঁদে উঠলো তার।

বিদ্যাসাগর বুঝলেন শিক্ষাই আলো। শিক্ষা ছাড়া মানুষের উন্নতি সম্ভব নয়। তাই স্কুল পরিদর্শক হয়ে তিনি শিক্ষা বিস্তারের জন্যে কাজে হাত দিলেন। কর্তৃপক্ষের মৌখিক অনুমতি নিয়ে পশ্চিম বঙ্গের চারটি জেলা -- হুগলী, মেদিনীপুর, নদীয়া ও বর্ধমানে পয়ত্রিশটি প্রাথমিক বিদ্যালয় খুললেন। আরো স্কুল স্থাপন করবেন, এই ছিল বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য। এমন সময় নতুন ইংরেজ কর্মকর্তা এসে তাঁর কাজে বাধা দিলেন। তিনি বিদ্যাসাগরের এত সুনাম, এত প্রতিপত্তি সহ্য করতে পারলেন না।

একদিন ইংরজ কর্মকর্তা বিদ্যাসাগরকে জানিয়ে দিলেন, নতুন কোন স্কুল স্থাপন করা চলবে না। এমনকি যে পয়ত্রিশটি স্কুল খোলা হয়েছে, সে গুলোকেও মঞ্জুরী দেয়া হবেনা।

বিদ্যাসাগরের হাতে কোন লিখিত অনুমতি ছিলনা। তাই তিনি বিপাকে পড়ে গেলেন। এদিকে ইংরেজ কর্মকর্তা খরচ বাঁচানোর জন্যে স্কুল খোলার বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডে কর্তৃপক্ষের কাছে লিখলেন। কর্তৃপক্ষ বিদ্যাসাগরের সমাজ সেবার কথা বিবেচনা না করে, ইংরেজ কর্মকর্তার কথাই মেনে নিলেন। বিদ্যাসাগর ইংরেজ সরকারের সাহায্য না পেয়ে জ্বিদ করে চাকরী ছেড়ে দিলেন।

তোমরা হয়তো ভাবছো, পাঁচশ' টাকার চাকরী ছেড়ে দিয়ে বিদ্যাসাগর ভেঙ্গে পড়েছেন। আসলে তা নয়। তিনি ছিলেন কর্মবীর। তিনি যে পয়ত্রিশটি স্কুল খুলেছিলেন, একটাও বন্ধ হতে দিলেন না। নিজের চেষ্টায় শিক্ষকদের বেতন ও স্কুলের সব রকম খরচ চালালেন। আরো স্কুল খুললেন। দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করে গেলেন বিদ্যাসাগর। তিনি শিক্ষা বিস্তারে যে অবদান রেখে গেছেন, তার তুলনা হয় না।

তোমরা নিশ্চয়ই জানতে পেরেছো, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন খুবই জেদী। তাই মানুষের মঙ্গলের জন্যে তিনি অনেক কঠিন কাজ করেছিলেন। এসব কাজের একটি হচ্ছে বিধবা বিবাহের প্রচলন।

হিন্দু সমাজে তখন বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিলনা। দেখা গেলো, পাঁচ বছরের একটি মেয়ের বিয়ে হলো। কোন কারণে মেয়েটির স্বামী গেলো মরে। মাত্র পাঁচ ছয় বছর বয়সে মেয়েটি হয়ে গেলো বিধাবা। হিন্দু সমাজে এই মেয়েটির আর বিয়ে হতোনা। হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। বিধবা বিবাহকে তারা শাস্ত্র মতে বৈধ মনে করতো না। ফলে পাঁচ ছয় বছরের একটি বিধবা মেয়েকেও ব্রহ্মচর্য পালন করতে হতো। সারা জীবন সহ্য করতে হতো অনেক সামাজিক অনুশাসন আর গঞ্জনা। ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর এসব লক্ষ্য করলেন। তাঁর বুক হু-হু করে কেঁদে উঠলো। তিনি বিধবা বিবাহ প্রচলনের প্রচেষ্টা হাতে নিলেন।

ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর বই লিখলেন। জানালেন, বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সিদ্ধ। ইংরেজ সরকারের কাছে দরখাস্ত করলেন

আইন করে বিধবা বিবাহ চালু করার জন্যে। এই দরখাস্তে এক হাজার লোকের স্বাক্ষর ছিল। বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধেও দরখাস্ত পড়লো অনেক । তাতে স্বাক্ষর দিয়েছিল ষাট হাজারের বেশী লোক।

বিদ্যাসাগর দমলেন না। তিনি তাঁর প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেন। তাঁর জীবননাশের হুমকী আসতে লাগলো। একজন পরিচিত ধনী লোক তাঁকে হত্যা করার জন্যে গুণ্ডা নিয়োগ করলেন। বিদ্যাসাগর তা টের পেয়েই একা একা ধনী লোকটির বাড়িতে ছুটে গেলেন। ধনী লোকটিকে বললেন ঃ আমাকে হত্যা করার জন্যে টাকা খরচ করে গুণ্ডা নিয়োগ করার কি দরকার? আমি নিজেই এসে গেছি। আমাকে হত্যা করুন।

ধনী লোকটি তখন তার লোকজন নিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলেন। তিনি লজ্জা পেলেন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে ক্ষমা চাইলেন।

বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালালেন বিদ্যাসাগর। সরকার বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব মেনে নিলেন। অবশেষে বিধবা বিবাহের প্রস্তাবটি আইনে পরিণত হলো। বিধবারা পেলো মানুষের অধিকার।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন দানবীর -- কর্মবীর -- ছিলেন সাহসীও। যার যা পাওনা, তা দিতে তাঁর কুণ্ঠা ছিলনা -- ছিলনা সাহসের অভাব।

বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন মিষ্টার কার। কি একটা কারণে বিদ্যাসাগর কার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। যথারীতি খবর দিয়েই তিনি ঢুকলেন কার সাহেবের কামরায়। বিদ্যাসাগর দেখলেন, সাহেব তাঁর পা দু'টি টেবিলের ওপর তুলে দিয়ে বসে আছেন। বিদ্যাসাগরকে দেখেও গা করছেন না। তাঁকে

মানুষ হিসেবে গ্রাহ্যই করছেন না। বিদ্যাসাগর মনে খুব আঘাত পেলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পর কার সাহেবের দরকার হলো বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করবার। কার্ড পাঠানো হলো বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। বিদ্যাসাগর অনুমতি দিলেন। কার সাহেব ভেতরে ঢুকে দেখতে পেলেন, ঈশ্বরচন্দ্র চটিজুতাসহ তাঁর পা দু'টি টেবিলে তুলে দিয়ে বসে আছেন। কার সাহেবকে দেখেই তিনি বললেন ঃ ওয়েল জেন্টল্‌ম্যান, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?

অপমানে সাহেব লাল হয়ে উঠলেন। চলে গেলেন হিন্দু কলেজে। কর্তৃপক্ষের কাছে জানালেন বিদ্যাসাগরের অভদ্র ও দুর্বিনীত ব্যবহারের কথা।

কর্তৃপক্ষের চিঠি এলো বিদ্যাসাগরের কাছে। চিঠিতে কড়া ভাষায় কৈফিয়ত তলব করা হলো এই অভদ্র আচরণের জন্যে।

বিদ্যাসাগর এমনটিই চেয়েছিলেন। তিনি কার সাহেবের আচরণের কথা বিস্তারিতভাবে লিখলেন কর্তৃপক্ষের চিঠির জবাবে। কর্তৃপক্ষ তাঁর এই চিঠি পেয়ে চুপ করে গেলেন। তারা বুঝলেন, ঈশ্বরচন্দ্র যা করেছেন, ঠিকই করেছেন। ঢিলটি মারলে যে পাটকেলটি খেতে হয়।

ঠাকুরদাদা রামজয়ের এঁড়ে বাছুর সত্যি তাঁর একগুঁয়েমী, দৃঢ় সংকল্প আর সাহস দিয়ে অনেক বড় হয়েছিলেন। আমরা আজ এমন মানুষই চাই।

অভ্যাস যদি ভাল হয়

কথায় বলে মানুষ অভ্যাসের দাস। তুমি যদি তোমার মধ্যে একটি ভাল অভ্যাস গড়ে তুলতে পারো, তা-ই একদিন তোমার জীবনে ফল দেবে, ছায়া দেবে -- তোমাকে করে তুলবে সুন্দর ও মহৎ। আর যদি তোমার মধ্যে গড়ে ওঠে মন্দ একটি অভ্যাস, তারও যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে তোমাকেই। এ সম্পর্কে তোমাদের একটি বাস্তব ঘটনা বলছি।

নিউ ইংল্যাণ্ডের একটি গ্রাম। সেখানকার একটি বিরাট কাঠের বাড়িতে বসবাস করতেন একজন ডাক্তার। তিনি ছিলেন দেশের একজন বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক। অস্ত্রোপচারে সারাদেশে তার জুড়ি মেলা ভার। দুঃখের বিষয় জীবনের একটা ধাপে এসে, ভদ্রলোকের মাথাটা বিগড়ে গেলো। পাগল মানে বদ্ধ পাগলই হয়ে গেলেন তিনি। সারাদেশের মানুষ দুঃখ করলো, আহা, এমন একজন ডাক্তার পাগল হয়ে গেলেন। এতে যে দেশেরই ক্ষতি। আক্ষেপ করে আর কি হবে, ভদ্রলোককে পাগলা গারদে ভর্তি করা হলো।

পাগলা গারদে তার চিকিৎসা চললো। চিকিৎসকরা আন্তরিকভাবে ভদ্রলোককে সারিয়ে তুলতে চেষ্টা করলেন। কোন প্রকার চিকিৎসা কিংবা যত্নের ত্রুটি হলোনা। কিন্তু ঘটে গেলো একটা আজব ঘটনা। ভদ্রলোক পাগলা গারদ থেকে পালালেন। টের পাওয়া গেলো বেশ কিছুক্ষণ পরে। পাগলা গারদের লোকজন ছুটলো তাকে ধরার জন্যে।

পাগল ডাক্তার পালালেন পাগলা গারদ থেকে। ভাল মানুষের মতই পথ চললেন তিনি। উঠলেন গিয়ে নিজের বাড়িতে। কোন রকম ভুল হলো না তার। দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। নিজের বাড়িতে এসে কেমন একটা ভাল লাগার

অনুভূতি ছড়িয়ে পড়লো তার মধ্যে। ঘুরে ঘুরে তিনি দেখলেন বাড়িটার বিভিন্ন কক্ষ। আগের মতই রয়েছে সবকিছু। একটা টেবিলে পড়ে আছে শিশি-বোতল, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। এটা ওটা নেড়ে-চেড়ে কেটে গেলো বেশ খানিকটা সময়।

পাগল ভদ্রলোকটি কিছু একটা করতে চান। অনেকদিনের কাজের অভ্যাস তাকে নাড়া দিচ্ছিল। এমন সময় দরজায় মানুষের ছায়া পড়লো। ডাক্তার দেখলেন, একজন পুরুষ একজন মহিলাকে পাঁজা কোলে নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। ডাক্তার ওদের ঘরে ঢোকার অনুমতি দিলেন। মহিলাকে ধরাধরি করে তোলা হলো একটি কামরায়। এবারে নবাগত পুরুষ ও মহিলাটির পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন।

পুরুষ ও মহিলাটি স্বামী-স্ত্রী। তারা নিউ ইংল্যাণ্ডের এই গ্রাম্য অচেনা পথ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তাদের গাড়িটা ধাক্কা খেলো পথের পাশে একটা গাছের সঙ্গে। ঘটে গেলো একটা দুর্ঘটনা। ভদ্রলোকের কোন আঘাত লাগেনি। কিন্তু তার স্ত্রী আহত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। তারা এ পথ দিয়ে যাওয়ার সময় ডাক্তারের সহিন বোর্ড দেখে গিয়েছিলেন। দুর্ঘটনায় পড়ে তাই ফিরে এলেন এই ডাক্তারের কাছে।

ডাক্তারও পাওয়া গেলো। মাথার চুল তার উস্‌কো-খুস্‌কো। দেখলেতো পাগলই মনে হয়। আর তিনিতো বদ্ধ পাগলই। আগন্তুকের ওসব চোখেই পড়েনি।

ডাক্তার মহিলার চিকিৎসা শুরু করলেন। ভালভাবে পরীক্ষা করে বল্‌লেন ঃ মহিলার মাথার খুলি ভেঙ্গে গেছে। জীবনের আশা খুবই কম। তবে অস্ত্রোপচার করলে বাঁচানো যেতে পারে।

ভদ্রলোক অগত্যা রাজী হয়ে গেলেন। অস্ত্রোপচার শুরু হলো। ডাক্তারের কথামত তাঁকে সাহায্য করলেন ভদ্রলোক। মহিলাকে অজ্ঞান করা হলো। যথারীতি অস্ত্রোপচারের কাজ শুরু হয়ে গেলো। ডাক্তারের আদেশে ভদ্রলোক গিয়ে বসলেন পাশের কামরায়।

এমন সময় তিনজন লোক ঝড়ের মত এসে দাঁড়ালো বাড়ির সামনে। তাদের দু'জনের হাতে অস্ত্র, আরেকজনের হাতে একগাছা দড়ি। তাদের দেখে চমকে উঠলেন স্বামী ভদ্রলোক। লোকগুলো ভেতরে ঢোকার জন্য এগিয়ে এলো। স্বামী ভদ্রলোকটি তাদের বাধা দিয়ে বললেন, আপনরা থামুন, ভেতরে একটা মারাত্মক অস্ত্রোপচার চলছে। কাজে ব্যাঘাত ঘটলে আমার স্ত্রীর মৃত্যু ঘটবে।

লোকগুলো জানালা দিয়ে দেখতে পেলো, সেই বদ্ধপাগল ডাক্তারটা অস্ত্রোপচার চালিয়ে যাচ্ছেন। দড়ি হাতে যে লোকটা এসেছিল, সে স্বামী ভদ্রলোককে বললো ঃ আপনি একি করেছেন। বদ্ধপাগলকে দিয়ে অস্ত্রোপচার করাচ্ছেন? লোকটাতো মানসিক হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এসেছে।

ততক্ষণে অস্ত্রোপচার অনেকদূর এগিয়ে গেছে। এ অবস্থায় কেউ তাকে বাধা দেয়া সঙ্গত মনে করলোনা। স্বামী ভদ্রলোক আতংকিত হলেন। তবুও কিছু বলার সুযোগ পেলেননা। কিছু বলতে গেলে পাগল লোকটা যে ক্ষেপে উঠবে। তার ফলে যে অঘটন ঘটে যাবে। অগত্যা অধীর আগ্রহে সবাই অপেক্ষা করলো।

ডাক্তার ভদ্রলোক তার দীর্ঘ দিনের অভ্যাসের বলে সুন্দরভাবে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করলেন।

অস্ত্রোপচার শেষ হতেই পাগলা গারদ থেকে আসা তিনজন লোক পাগল ডাক্তারকে ধরে ফেললো। কিছুক্ষণ ধ্বস্তা-ধ্বস্তির পর দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাধা হলো তাকে। তারপর আবার পাগলা গারদে নিয়ে যাওয়া হলো।

স্বামী ভদ্রলোকটি তার স্ত্রীকে নিয়ে গেলেন নিউইয়র্ক শহরে। সেখানে প্রসিদ্ধ ডাক্তার তাকে ভালভাবে দেখে বললেনঃ অস্ত্রোপচার নিখুঁত হয়েছে। মহিলা সম্পূর্ণ আশংকামুক্ত। এমন অস্ত্রোপচারতো একজনই করতে পারেন, যিনি এখন পাগলাগারদে বন্দী।

কেমন করে সম্ভব হলো এই জটিল অস্ত্রোপচার? সম্ভব হলো দীর্ঘ দিনের অভ্যাসের বলে। একটি ভালো অভ্যাস মানুষের জন্য কল্যাণকর নয় কি?

মহাকবি মহাপ্রাণ

তিনি ছিলেন একজন মহাকবি। তিনি ছিলেন মহাপ্রাণ। আমাদের বাংলাদেশের মাটি যশোর জেলার সাগরদাঁড়ী গ্রামে জন্ম নিয়েছিলেন তিনি। অগাধ সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন তাঁর পিতা রাজনারায়ণ দত্ত। তিনি জানতেন, পিতার একমাত্র উত্তরাধিকার হিসেবে তিনিই হবেন পিতার সমস্ত ধনসম্পদের মালিক। অন্য মানুষ হলে এত ধন-সম্পদ পেয়ে জীবনটা সুখেই কাটিয়ে দিতো। তিনি কিন্তু তা করলেন না। তিনি চাইলেন শেক্সপিয়র মিল্টনের মত বড় কবি হতে, জাঁদরেল একজন ব্যারিষ্টার হতে। তাঁর এই উচ্চাকাঙ্খা অনেকখানি পূরণ হয়েছিল। সেজন্যে তাঁর ছিল নিরলস পরিশ্রম, ঐকান্তিক সাধনা। এই মহাকবির নাম কি জানো? নাম তাঁর মাইকেল মধুসূদনদত্ত।

মধুসূদনের উচ্চাকাঙ্খা তাঁকে সাধারণ জীবনে স্থির থাকতে দেয়নি। তিনি উল্কার মত ছুটে গেছেন কোলকাতা থেকে লণ্ডন। লণ্ডন থেকে প্যারিস। কিন্তু কিসের মোহে? তাতো আগেই বলেছি। সাহিত্য চর্চ্চা এবং বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় দক্ষতা ও উচ্চ শিক্ষা অর্জনই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

বাংলা ভাষায় অমর কাব্য রচনা করে গেছেন তিনি। তাঁর অমর কীর্তি মেঘনাদ বধ কাব্য। এই গ্রন্থ পণ্ডিত মহলে যেমন সমাদর লাভ করে, তেমন সাধারণ পাঠকের কাছেও পরিচিতি লাভ করে। নীচের ঘটনাটি থেকেই মেঘনাদ বধ কাব্যের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে বুঝতে পারবে।

একদিন মধুসূদন কলকতায় চীনাবাজার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। সহসা তাঁর চোখ পড়লো এক দোকানদারের

দিকে। দোকানদার গভীর আগ্রহের সঙ্গে মেঘনাদ বধ কাব্য পড়ছেন। মধুসূদন এগিয়ে গেলেন দোকানীর দিকে। জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি পড়ছেন?

দোকানী বললেন ঃ আজ্ঞে একটি নতুন কাব্য।

মধুসূদন বললেনঃ বাংলা ভাষায় কোন কবিতাই নেই, আবার কাব্য।

দোকানী বললেন ঃ এমন একখানি কাব্য একটি জাতির ভাষাকে গৌরবময় করতে পারে।

মধুসূদন বললেনঃ তা একটু পড়ুন দেখি।

দোকানী খানিকটা পড়ে শোনালেন।

মধুসূদন তার হাত থেকে কাব্যখানা নিয়ে পড়ে শোনালেন। দোকানী কবির পাঠ শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। মধুসূদনের পরিচয় জানতে চাইলেন। কবি পরিচয় গোপন রেখে চলে এলেন।

মধুসূদনের সাহিত্য সাধারণ মানুষের কাছে সমাদর লাভ করেছিল। সত্যি, তাঁর কবি জীবন সার্থক।

মধুসূদন বিষয় সম্পত্তি পত্তনি দিয়ে, বাসভবন বিক্রি করে বিলেত গিয়েছিলেন ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্যে। পত্তনীদার টাকা পাঠালো না, তাই মধুসূদন পড়ে গেলেন অর্থসংকটে। পুত্র-কন্যা নিয়ে স্ত্রী হেনরিয়েটা গিয়ে উঠলেন লণ্ডনে স্বামীর কাছে। তাঁরা লণ্ডন থেকে চলে গেলেন ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে। দারুণ অর্থসংকটে পড়লেন মধুসূদন। এমন হলো যে, বাকিতে জিনিসপত্র কিনতে তিনি বাধ্য হলেন। টাকা পরিশোধ করতে না পারায় দোকানীরা তাঁকে চাপ দিতে লাগলো। সামান্য খাবারের জন্য তাঁকে ঘরের আসবাবপত্র, স্ত্রীর পোষাক, বই-পুস্তক এমনকি উপহার পাওয়া পানপাত্রও বন্ধক দিতে হলো। বাকি পড়লো তাঁর ঘর ভাড়া।

লাঞ্ছনা দিতে লাগলো বাড়িওয়ালা। এসময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেন।

অর্থসংকট মধুসূদনের নিত্যসঙ্গী হলো। তিনি ধার করলেন, কিন্তু পরিশোধ করতে পারলেন না। ঋণদাতারা তাগাদা দিতে লাগলো। তাদের নির্যাতনে প্যারিসের একটা অঞ্চলে পালিয়ে থাকলেন তিনি। তখন ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ চলছিল। এই বিদ্রোহের নেতাদের একজন ছিলেন নানা সাহেব। ফরাসী পুলিশ মধুসুদনকে নানা সাহেবের অনুসারী বলে সন্দেহ করলো। তারা তাঁকে গ্রেফতার করতে চাইলো। পরে প্রকৃত পরিচয় পেয়ে নিষ্কৃতি দিলো।

একবার প্যারিস নগরীতে মধুসূদন দারুণ অভাবে পড়লেন। দু'টি শিশু সন্তানের মুখে খাবার তুলে দিয়ে স্বামী–স্ত্রী উপোষ করতে লাগলেন। প্রতিবেশীরা বিষয়টি জানতে পারলেন। তাঁরা গোপনে ঘরের দরজায় একটি টেবিলের ওপর খাবার সামগ্রী, শিশুদের দুধ ও মিষ্টান্ন রেখে যেতেন। মধুসূদন কিছু মনে করতে পারেন, তাই তাঁরা চিঠি লিখে যেতেন, মহাশয়, আপনি এসব গ্রহণ করলে কৃতার্থ হবো।

মধুসূদন ফরাসী জাতির মহানুভবতায় অভিভূত হয়ে পড়তেন। নীরবে কাঁদতেন।

তোমরা ভাবছো, অর্থসংকটে পড়ে কবি বোধ হয় তাঁর সাহিত্য চর্চা আর উচ্চ শিক্ষার সংকল্প পরিত্যাগ করেছেন। না, তিনি তা করেননি। তিনি ছিলেন তাঁর সংকল্পে অটল , অবিচল। কবি ব্যারিষ্টারী পাশ করেন। ফরাসী ও ইটালী ভাষায় অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করেন। এই দুই ভাষায় তিনি কবিতাও লিখতে পারতেন।

বিরাট সাফল্য নিয়ে ফিরে এলেন তিনি কলকাতা। ব্যারিষ্টার হিসেবে শুরু করলেন আইন ব্যবসায়। তখন কলকাতা

হাইকোর্টে বাঘা বিচারক নামে পরিচিত জ্যাক্‌সন সাহেবের ভয়ে সকল আইনজীবী তটস্থ থাকতেন। মধুসূদন কিন্তু তাঁর মক্কেলের পক্ষে উচ্চ কণ্ঠে কথা বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না। তিনি যুক্তি দিতে গিয়ে কখনও ইংরেজী কবিতা কখনও বাংলা-কবিতা আওড়াতেন।

একদিন জ্যাক্‌সন সাহেব মধুসূদনকে উচ্চকণ্ঠে কবিতা আওড়াতে দেখে বললেন ঃ তুমি বড়ো বাজে বকো। কথায় কথায় কবিতা আওড়াও।

তেজস্বী মধুসূদন উচ্চকণ্ঠে জবাব দিলেন ঃ আমি বাজেই বকি আর কবিতাই আওড়াই, তোমাকে তা শুনতেই হবে। আমি তোমাকে বলিনা, বেঞ্চকে বলি।

হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে লাগলেন মধুসূদন। তোমরা হয়তো ভাবছো, এবারে কবির অভাব ঘুচলো। টাকা জমিয়ে বড় একজন ধনী হয়ে গেলেন তিনি। আসলে অমন প্রকৃতিই ছিল না তাঁর! প্যারিসে কতদিন না খেয়ে থাকলেন, সে কথা একেবারেই ভুলে গেলেন তিনি। প্রচুর টাকা আসলো তাঁর হাতে, খরচও করলেন মুঠি মুঠি।

মধুসূদন ছিলেন দানশীল ও দয়ালু ব্যক্তি। তিনি দাস-দাসীকে যখন তখন বখ্‌শিস দিয়ে খুশী করতেন। গাড়োয়ানকে টাকা দিতেন, কিন্তু গুণে দিতেন না। যে কেউ টাকা চাইলে তিনি উদারভাবে সাহায্য করতেন। এমন কি ছাত্রজীবনে তিনি সহপাঠীদের অর্থকষ্টেও সাহায্য করেছেন।

একবার সাগরদাঁড়ী থেকে মধুসূদনের ছেলেবেলার গুরুমশায় এসে হাজির হলেন তাঁর কলকাতার বাসায়। বুড়ো গুরুমশায় অভাবে পড়ে সাহায্য চাইলেন মধুসূদনের কাছে।

মধুসূদন তাঁর হাতে পঞ্চাশটি টাকা তুলে দিলেন। কবির স্ত্রী এই দানকে বাহুল্য বলাতে কবি জবাব দিলেন, আমার হাতে

টাকা থাকলে গুরুমশায়ের হাতে আরো টাকা তুলে দিতাম। তাঁর বেত্রাঘাতের চিহ্ন হয়তো এখনও আমার শরীরে আছে।

একদিন মধুসূদন শকটে চড়ে হাইকোর্ট থেকে ঘরে

ফিরছিলেন। রাস্তার পাশে কতগুলো ছেলে ছেঁড়া কাগজপত্র কুড়াচ্ছিল। মধুসূদন শকট থেকে নেমে ছেলেগুলোর কাছে গেলেন। ছেলেরা কি করছে, তিনি তা জিজ্ঞেস করলেন।

ছেলেদের একজন জবাব দিলোঃ আমরা লেখাপড়া করবো

বলে আদালতের ফেলে দেয়া কাগজ, ব্লটিং, নিব খুঁজছি। মধুসূদন তখন সবার হাতে একটি করে সিকি দিয়ে বললেনঃ যাও, তোমরা কাগজ কলম কিনে লেখাপড়া করো।

একদিন একটা ঠিকা গাড়িতে চড়ে মধুসূদন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাড়িতে গেলেন। গাড়ি থেকে নেমেই কোচম্যানকে একটি মোহর দিলেন। বিদ্যাসাগর দেখতে পেয়ে মধুসূদনকে এই অপব্যয় না করার উপদেশ দিলেন। মধুসূদন জবাব দিলেন, সে আমাকে নিয়ে এত ঘুরে বেরিয়েছে, তাকে একটি মোহরের বেশী তো দেইনি।

এমন অজস্র ঘটনা তুলে ধরা যায় মধুসূদনকে নিয়ে। তিনি ছিলেন সংকল্পে অটল, কর্তব্যে সাহসী এবং মানবদরদী বিশাল এক মানুষ। তাঁর আদর্শ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি।

আগে চাই কাজ

আমাদের টিপুকে তোমরা চেন?

ওইযে ভারী চালাক ছেলেটা। হ্যা, চিনেছো তা হলে। বয়স তার কম হলে কি হবে, সব বিষয়ে সে এমন একটা ভাব দেখায়, যেন তার মত সবজান্তা আর কেউ নেই। সুযোগ পেলেই সে আশে পাশে লোকদের উপদেশ দিয়ে বেড়ায়।

সেদিনকার ব্যাপরটা বলছি।

স্কুলে যাওয়ার সময় হলো। টিপুর কিন্তু একটুও স্কুলে যেতে ইচ্ছে করলোনা। সে পেট ব্যথার ভান করে চৌকিতে গড়াগড়ি যাচ্ছিল। অবশ্য বেশীক্ষণ পেট ব্যথার ভান করতে হলো না। যে মেজভাই তাকে উঠতে বসতে শাসন করে, সে আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। তাই তো টিপু চৌকিতে শুয়ে দিব্যি আরামে সময় কাটাতে লাগলো। সহসা তার চোখে পড়লো জানালার পাশে মাকড়সার একটি চমৎকার জাল। কি সুনিপুন সে জালের বুনোট। জালটা দেখতে বৃত্তের মত। কেন্দ্র বিন্দুতে বসে আছে একটি মাকড়সা। পোকা ধরবার জন্যে ওৎ পেতে বসে আছে সে। আসলে মাকড়সার জালটাই পোকা ধরবার একটা ফাঁদ। টিপু ভাবলো, একটি ক্ষুদ্র মাকড়সার কি বুদ্ধি। নিজের পেটের ক্ষুধা মিটানোর জন্যে কতনা কৌশল জানে সে। টিপু কতক্ষণ মাকড়সাটার দিকে তাকিয়ে থাকলো। লক্ষ্য করলো, বেচারীর ভাগ্যে একটা শিকারও জুটছে না। একটি ক্ষুদ্র পোকাও পড়ছেনা তার জালে। বাঁচবার বুদ্ধি কারই বা কম।

টিপুর ভারী মায়া হলো মাকড়সাটার জন্যে। সে জানালার ঝুলকালিতে বসে থাকা আধমরা একটা মশা মেরে জালের গায়ে লাগিয়ে দিলো। অসাবধানবশতঃ হাতে লেগে জালের

খানিকটা ছিঁড়ে গেলো। মাকড়সা ভয়ে এক রকম পালিয়ে গিয়েছিল। টিপুকে সরে যেতে দেখে আবার সে নিজের স্থানটিতে এসে বসলো। জালের খানিকটা ছেঁড়া দেখে টিপুর দিকে তাকিয়ে গজর গজর করে বল্‌লোঃ আমার জালটা ছেঁড়ার কি দরকার ছিল বাপু। তোমরা যা দুষ্টু একেক খানা--

টিপু বললোঃ ইচ্ছে করে ছিঁড়িনি। হাতে লেগে গেছে। তোমার জন্যে ওই মশাটা মেরে দিলাম, খাও।

মাকড়সা বললোঃ আমরা কারুর দান নেইনে বাপু। নিজেদের রোজগারে যা জোটে তাই খাই।

টিপু বললোঃ তোমার ছেলেপুলেদের জন্যে খেতে দিলাম। রাখলে খুশী হবো।

মাকড়সা বললোঃ তুমি যখন খুশী হলে, তখন কি আর না রেখে পারি। আমার ছোট ছেলেটা আবার মশা খেতে ভালবাসে।

টিপু বললোঃ বেশ, দিও। বলে দিও, তোর এক চাচা এই মশাটা তোকে উপহার দিয়েছে।

মাকড়সা বললোঃ বলবো ভায়া বলবো। তোমরাতো আবার একটু দান করে নাম করতে ভালবাস।

টিপু মাকড়সার এ কথায় রেগে গেলো। বললোঃ আমার মশাটা না পেলে তোমার ছেলেটাকে কি খাওয়াতে, বলো?

এবারে মাকড়সা রেগে গিয়ে বললোঃ সামান্য দান করে খোঁটা দিলে? তোমার দানটা না পেলে কি আমার খাবার জুটতোনা? আমিকি ভিখিরি? নাও, তোমার দান ফিরিয়ে নাও। ছিঃ ছিঃ, কত ক্ষুদ্র মন তোমার।

একটা সামান্য মাক্রড়সা যে এমন তুলকালাম কান্ড ঘটিয়ে বসবে, টিপু তা ভাবতেও পারেনি। সে তাই রেগে বললোঃ দান করাটা আমাদের নতুন নয়। আমার বাপ দাদাও দান করতেন। এইতো সেদিন বাজারে এক ভিক্ষুককে একটা সিকি দিয়ে ফেল্‌লাম।

মাকড়সা বললোঃ তাই বলে অমন বড়াই করতে নেই বাপু।

টিপু বলোঃ রাখো রাখো বাপু। অত বেশী কথা শোনার সময় আমার নেই। মেলা কাজ আছে হাতে।

এমন সময় জানালার কাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল একটা কাঠ পিঁপড়ে। সে হাসতে হাসতে টিপুকে বললোঃ তর্কে হেরে গেলেই রাখো রাখো মেলা কাজ আছে। আসলে তোমাদের মানুষদের দেখে আর বাঁচিনে বাপু।

টিপু দস্তুর মত রেগে গিয়ে বললোঃ পরের কথায় নাক

গলানোর কি দরকার তোমার। যাও যাও, নিজের কাজে যাও।

পিঁপড়ে বললোঃ দ্যাখো, অত চড়া গলায় কথা বলোনা। কারুর মনে আঘাত দেয়া অন্যায় কিন্তু।

টিপু বললোঃ ওসব ন্যায়-অন্যায়ের উপদেশ আমি ঢের জানি বাপু। আমাকে কেউ উপদেশ দিতে এসোনা। যদি দরকার হয় আমার কাছ থেকে দু'দশটা ধার নিতে পারো।

এমন সময় মেজভাই ঘরে ঢুকে দেখতে পেলো টিপু স্কুলে যায়নি। ঘরে বসে বসে অযথা সময় নষ্ট করছে। সে টিপুকে কানে ধরে সামনে টেনে নিয়ে বললোঃ হতচ্ছাড়া, তুই স্কুলে যাস্‌নি। বসে বসে সময় নষ্ট করছিস্‌, পিটিয়ে তোর পিঠের চামড়া তুলে দেবো।

ব্যাপার দেখে হি-হি-করে হেসে উঠলো মাকড়সা ও পিঁপড়ে। তারপর সমস্বরে বললোঃ নিজের কর্তব্যজ্ঞান নেই, অন্যকে এসেছেন উপদেশ দিতে। হি-হি-হি--

টিপু লজ্জায় লাল হয়ে গেলো। সত্যিইতো, নিজের কাজ ফেলে কথা বলাতো তার ঠিক হয়নি।

(নিজস্ব)

মানবদরদী কবি

বাড়ি থেকে দু'টি কিশোর স্কুলে যাচ্ছে। একটি শিশু সে দিকে কিচ্ছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কেঁদে ফেললো। বায়না ধরে বললোঃ আমি স্কুলে যাবো, আমি স্কুলে যাবো।

গৃহ শিক্ষক সেখানেই ছিলেন। হাসলেন তিনি। শিশুটি স্কুলে যাওয়ার জন্যে বায়না ধরে কাঁদতেই থাকলো। এবারে গৃহশিক্ষক শিশুটিকে বোঝালেন, তার স্কুলে যাওয়ার বয়স এখনও হয়নি। পথে ভারী কষ্ট।

শিশুটি কিন্তু তা শুনলোনা। সে কাঁদতেই থাকলো। গৃহশিক্ষক রেগে শিশুটির পিঠে এক চড় বসিয়ে দিয়ে বললেনঃ এখন স্কুলে যাওয়ার জন্যে যেমন কাঁদছো, পরে না যাওয়ার জন্যে আরো বেশী কাঁদবে।

সত্যি সত্যিই একদিন স্কুলে না যাওয়ার জন্যেই কেঁদেছিল সে।

একটু বড় হলে স্কুলে পড়তে দেয়া হলো তাকে। ছোটবেলা থেকেই চাকর বাকরদের হাতে বন্দী জীবনের কষ্ট সইতে হয়েছে তাকে। স্কুলও মনে হলো বন্দীজীবন। মাস্টার মশাইদের হাতে বেত, মুখে বকুনী। হাঁপিয়ে উঠলো শিশুটির মন। দু'দিনেই স্কুল ছাড়লো সে।

শিশুটি আর স্কুলে যেতে রাজী নয়। অভিভাবকরা মহা ভাবনায় পড়ে গেলেন। তাঁরা ভাবলেন, নতুন পরিবেশে গিয়ে তার মন হয়তো বদলাতে পারে। এবারে ভর্তি করা হলো নর্মাল স্কুলে। চমৎকার স্কুলটি--দেখতেও ভারী সুন্দর। এখানেও শিশুটি হাঁপিয়ে উঠলো।

পর পর কয়েকটি স্কুলেই পড়েছে এই ছেলেটি। কিন্তু ম্যাট্রিকটাও পাশ করতে পারেনি। তোমরা হয়তো ভাবছো,

ম্যাট্রিকটাই পাশ করতে পারলোনা যেই ছেলে, তাকে নিয়ে আবার ফলাও করে গল্প করা হচ্ছে, তাও কিনা বইয়ের পাতায়।

হ্যা, ছেলেটিকে নিয়ে একদিন সারা পৃথিবীই মেতে উঠেছিল। একদিন সারা পৃথিবী বরণ করে নিয়েছিল তাঁকে। তিনি আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্কুলের পড়া তাঁর ভাল লাগেনি। তাই বলে তোমরা ভেবোনা, তিনি পড়াশোনা করেননি। ভিন্ন ভিন্ন গৃহ শিক্ষকএসে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় পড়াতেন তাঁকে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, ভুগোল—সব বিষয়েই অগাধ জান অর্জন করেছিলেন তিনি। আর ছোট বয়সেই কবিতা লিখে মুগ্ধ করেছিলেন সবাইকে। তাঁর ছোট বেলার একটা কবিতা তোমাদের ভাল লাগবে।

আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলী দলি,
সন্দেশ মাখিয়া লয়ে তাতে—
হাপুস হুপুস শব্দ, চারিদিক নিস্তব্ধ
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

রবীন্দ্রনাথ পড়াশোনায় যে কত ভাল ছিলেন, তা তোমাদের ভাবতেও অবাক লাগবে। তাঁকে ইংরেজী পড়াতেন শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ.। রবীন্দ্রনাথ তখন কিশোর মাত্র। তিনি এই বয়সেই ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। বাংলা ছন্দে শেক্সপীয়রের বিখ্যাত নাটক ম্যাকবেথের তর্জমা করতে পারতেন তিনি।

একবার কবির গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁকে নিয়ে গেলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে। জ্ঞানচন্দ্র বললেনঃ রবিকে নিয়ে এসেছি আপনার কাছে, সে আপনাকে ম্যাকবেথের তর্জমা শোনাবে।

বিদ্যাসাগর মুচকি হেসে বললেনঃ শোনাওতো!

রবীন্দ্রনাথ ম্যাকবেথ পড়লেন আর বাংলা ছন্দে অনুবাদ করে শোনালেন।

কিশোর রবীন্দ্রনাথের তর্জমা শুনে মুগ্ধ হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

তোমরাতো ভাল করেই জানো, পরবর্তীকালে ১৯১৩ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। বিশ্বকবি হয়ে বিশ্বের দরবারে গৌরবান্বিত করেছিলেন বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালী জাতিকে। কিন্তু তিনিতো হঠাৎ এই শিরোপা অর্জন করেননি। কিশোরকবি রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে সুধী ও গুণীজন বুঝতে পেরেছিলেন, এই কিশোর একদিন বিশ্বকে নাড়া দেবে।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের মেয়ের বিয়েতে অনেক গুণীজনকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তাঁদের একজন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই সভায় সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে কাছে পেয়ে সবাই আনন্দিত। রমেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে অভিনন্দন জানানোর জন্যে তাঁর গলায় মালা পরাতে এগিয়ে গেলেন। বঙ্কিমচন্দ্র মালাটি হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি রবীন্দ্রনাথের গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেনঃ এই মালাটি এঁরই প্রাপ্য। রমেশ, তুমি কি এঁর সন্ধ্যাসঙ্গীত পড়েছ?

বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে তাঁর 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' কাব্যের প্রশংসা করতে লাগলেন। তাই বলছিলাম, কিশোর রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই ঘুমিয়েছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের একজন সেরা কবিই নন, তিনি ছিলেন বিশ্বের সেরা মানুষদেরও একজন। তাই তিনি সেরা মানুষ তৈরির জন্যে শান্তি নিকেতনে প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শে স্থাপন করেছিলেন বোলপুর ব্রহ্মচর্য আশ্রম। এই বিদ্যালয়ই পরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিনত হয়।

রবীন্দ্রনাথ একা এই বিদ্যালয়ের দায়িত্ব পালন করতেন। এর খরচ জোগাতে গিয়ে তিনি দারুন অর্থ সংকটে পড়েছিলেন। পুরীর সমুদ্রতীরের বাড়িটা বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই বিদ্যালয়ের খরচ জোগাতে গিয়ে অনেক বিষয়সম্পত্তি খোয়াতে হয়েছিল তাঁকে। কবিপত্নী মৃনালীনী দেবীও দাঁড়িয়েছিলেন স্বামীর পাশে। হাসিমুখে নিজের গায়ের গয়না খুলে দিয়েছিলেন কবির হাতে। তাঁদের অসামান্য ত্যাগের বিনিময়েই গড়ে উঠেছিল আজকের বিশ্বভারতী।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মানবদরদী। জমিদারী দেখাশোনা করতে গিয়ে দেশের প্রকৃতি ও মানুষকে কাছ থেকে দেখতে পেয়েছিলেন তিনি। দরিদ্র প্রজাদের অবস্থা দেখে হু-হু করে কেঁদে উঠেছিল তাঁর বুক। দিনরাত ভাবতেন, কেমন করে

প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করা যায়, সুখ-শান্তিতে ভরিয়ে তোলা যায় তাদের জীবন।

মানবদরদী রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটি গল্প বলছি। একবার তিনি ডিঙ্গি চড়ে পদ্মার বুকে বেড়াচ্ছিলেন। নদীতে ছিল প্রবল স্রোত। একটা জেলে-ডিঙ্গি পড়ে গেলো সর্বনাশা স্রোতের আবর্তে। আর যে উপায় নেই। ডিঙ্গিটা ঘুরতে লাগলো চরকির মত। অন্য জেলেরা নিজ নিজ ডিঙ্গি সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। ঘটনাটা দেখতে পেলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি জেলেদের বললেন ওকে সাহায্য করতে। জেলেরা কেউ কবির কথায় সাড়া দিলোনা। এবারে কবি ঘোষণা করলেন, ডিঙ্গিটা বাঁচালে মোটা পুরষ্কার দেয়া হবে। জেলেরা পুরষ্কারের লোভে আবর্তের মুখ থেকে ডিঙ্গিটা টেনে আনলো।

একবার কোন একটা গ্রামে আগুন লেগেছিল। একে একে বহু ঘর-বাড়ি পুড়ে গেলো সেই আগুনে। শত চেষ্টা করেও আগুন নেভানো গেলোনা। কারণ সেই গ্রামে কোন কুঁয়ো ছিল না। তাই পানির অভাবে পুড়ে গেলো অনেক ধন-সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ সেই এলাকায় কুঁয়ো খুঁড়ে নেয়ার পরামর্শ দিলেন। কুঁয়ো খোঁড়ার জন্য পারিশ্রমিকও দিলেন। এভাবেই সেই এলাকায় কুঁয়োর ব্যবস্থা হলো।

রবীন্দ্রনাথ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিখেছিলেন। তিনি নিজে গিয়ে প্রজাদের চিকিৎসা করতেন। সুখে দুঃখে পাশে দাঁড়াতেন।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সাদা-সিধে সহজ প্রাণের মানুষ। তখন তাঁর বয়স হয়েছে। সাদা চুল আর দাঁড়িতে দরবেশের মত সৌম্য মনে হতো তাঁকে। একদিন নিজের আশ্রমের কাছে পথ বেয়ে হেঁটে আসছিলেন তিনি। একটি মারাঠী ছেলে ছুটে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালো। রবীন্দ্রনাথ ছেলেটার কান্ড দেখে থমকে দাঁড়ালেন। ছেলেটা তাঁর হাতে একটা আধুলি গুঁজে

দিতে চাইলো। প্রথম রবীন্দ্রনাথ নিতে চাইলেন না। পরে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আধুলিটা হাতে নিলেন। আসলে ছেলেটা রবীন্দ্রনাথকে একজন দরবেশ ভেবে আধুলিটা দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথও তা বুঝতে পেরে আধুলিটা গ্রহণ করেছিলেন। ভেবে দেখতো, কেমন সাদা-সিধে সহজ প্রাণের মানুষ ছিলেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সহজ-সরল আবার ছিলেন প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর।

১৯১৯ সালের ১৬ই এপ্রিল। পাঞ্জাবে রাউলট আইন নামে এক আইন জারি করা হয়। পাঞ্জাবের লোকেরা এই আইন মানতে রাজী হলোনা। তারা এই আইনের প্রতিবাদে জালিয়ানওয়ালাবাগে এক সভায় মিলিত হলো। বিশাল মাঠ। প্রবেশ করার পথ মাত্র একটাই। জেনারেল ডায়ার সেই পথ জুড়ে বিপুল সৈন্য সমাবেশ করলেন। যেই না শুরু হলো সভা, ডায়ার সাহেব আদেশ দিলেন, চালাও গুলি।

বিশাল সমাবেশের ওপর গুলি চালানো হলো। নির্মমভাবে হত্যা করা হলো নারী, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ--বহু লোককে। প্রায় চারশ' মানুষ তখনই প্রাণ হারালো। শত শত আহত হলো।

খবর শুনে রবীন্দ্রনাথ বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। তিনি এই নির্মম হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ করে বড়লাট লর্ড চেমস্ ফোর্ডকে চিঠি লিখলেন। পরিত্যাগ করলেন নাইট উপাধি।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মানবদরদী--অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর।

প্রকৃত অসুখী

সেভিয়েত ইউনিয়নের বিখ্যাত কবি আলেক্সান্দর পুশ্‌কিনের রচিত একটি মজার গল্প শোনাবো তোমাদের। গল্পটি পদ্যে রচনা করেছেন কবি। এটি একদিকে যেমন মজার, আরেক দিকে শিক্ষামূলক। গল্পটি পড়েই দেখোনা।

নীল সাগরের কুলের কাছে বাস করতো এক বুড়ো আর এক বুড়ি। জরাজীর্ন মাটির কুটিরে তারা কাটিয়ে দিলো তেত্রিশ বছর। বুড়ো সমুদ্রে মাছ ধরতো জাল দিয়ে। বুড়ি ঘরে বসে সুতো কাটতো। কোন রকম কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো।

একদিন বুড়ো গেলো সমুদ্রে মাছ ধরতে। জাল ফেললো। মাছ উঠলোনা। উঠলো কিছু কাদা। আবার জাল ফেল্‌লো, এবারে উঠলো সমুদ্রের ঘাস। মনে ভারী দুঃখ পেলো বুড়ো। তিনবারের বার জাল ফেলেলো বুড়ো। উঠলো একটা অদ্ভুত সুন্দর মাছ। সোনার মাছ। আকুল মিনতি করে মানুষের গলায় বললো মাছটিঃ আমাকে ছেড়ে দাও। তোমাকে মুক্তিপণ দেবো। তুমি যা চাইবে তাই দেবো তোমাকে।

বুড়ো অবাক হয়ে গেলো মাছের মুখে মানুষের কথা শুনে। সোনার মাছটির জন্যে তার মায়া হলো। সে বললোঃ তোকে আমি এমনিই ছেড়ে দেবো। সাগরের মাছ সাগরে খেলে বেড়াবি। বুড়ো ছেড়ে দিলো মাছটা। সোনার মাছ বুড়োর কুশল কামনা করে মিশে গেলো অথৈ সাগরের পানিতে।

বুড়ো ফিরে গেলো ঘরে। সব কথা খুলে বললো বুড়িকে। কেমন করে একটি মাছ উঠলো জালে, সে মুক্তিপণ দিতে চাইলো অনেক, কিছুই নিলোনা বুড়ো---সব কথা খুলে বললো বুড়িকে। বুড়ি গেলো রেগে। বকে উঠলো সেঃ তুমি একটা আস্ত হাঁদা। আমাদের বারকোশটা ভেঙ্গে গেছে। তুমি

একটা নতুন কাঠের বারকোশ চাইলেইতো পারতে!

বুড়ো ছুটে গেলো নীল সাগরের ধারে। ডাকাডাকি করলো সোনার মাছকে। সাঁতরে এসে সোনার মাছ বললোঃ কি চাই তোমার বুড়ো? বুড়ো বললোঃ বুড়ি আমায় ভারী গাল দিচ্ছে। তার একটা নতুন বারকোশ চাই। দাওনা আমায় ভাই। মাছ বললোঃ যাও, ঘরে ফিরে যাও। নতুন বারকোশই তোমরা পাবে।

বুড়ো ঘরে ফিরে দেখলো, বুড়ির সামনে নতুন একটাবারকোশ। এবারে আরো ক্ষেপে গেলো বুড়ি। মুখ ছোটালোঃ আরে হাঁদারাম, ভারীতো একখানা বারকোশ চাইলে। কিইবা এর দাম। যাওনা, কোঠাবাড়ি চাওগে।

আবার বুড়ো গেল নীল সাগরের ধারে। ডাকলো সোনার মাছকে। সাঁতরে এসে সোনার মাছ বললোঃ ফের কি চাই তোমার। বুড়ো বললোঃ বুড়ি আমার চাইছে কোঠাবাড়ি। শান্তিতে দাঁড়াতে দিচ্ছে না ঘরে।

সোনার মাছ বললোঃ যাও, ঘরে ফিরে যাও। তোমাদের কোঠাবাড়িই হবে।

বুড়ো বাড়ি ফিরে দেখলো, তাদের জরাজীর্ন কুঁড়ে ঘরের চিহ্ন কোথাও নেই। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে দিব্যি একখানা কোঠাবাড়ি। জানালা খুলে বসে আছে বুড়ি। বুড়োকে দেখেই সে শুরু করলো গালাগাল, ওরে বোকা বুড়ো, চাইলি মাত্র একটা কোঠাবাড়ি। খেটে খেতে আর চাইনে। সোনার মাছকে বল্‌গে, বনেদী জমিদারনী হতে চাই।

আবার ছুটে গেলো বুড়ো সাগরের পাড়ে। ডাকলো সোনার মাছকে। সোনার মাছ এগিয়ে এসে বললোঃ কি চাই, বুড়ো? বুড়ো বললোঃআমার বুড়ি চায় বনেদী জমিদারনী হতে।

সোনার মাছ বললোঃ তাই হবে।

বুড়ো বাড়ি ফিরে দেখলো মস্ত এক পুরী। দিব্যি এক জমিদার বাড়ি। দামী ঝলমলে পোষাক পরে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে বুড়ি। চারদিকে তার তটস্থ দাসদাসী। বুড়ি কাউকে মারছে, কাউকে গাল দিচ্ছে। বুড়োকে দেখতে পেয়েই সে চোটপাট শুরু করে দিলো। এটা ওটা হুকুম দিয়ে খাটিয়ে নিলো তাকে। বুড়োকে খাটালো চাকরের মত। আস্তাবলের কাজ দিলো তাকে। এমনি কাটলো সপ্তাহ খানেক। বুড়ি আরো ক্ষেপে গিয়ে বললো বুড়োকেঃ আর জমিদারনী থাকতে চাইনে। এবার হবো একচ্ছত্র রানী।

বুড়ো অনেক বোঝালো তার বুড়িকে। রানী হওয়া তার মানায়না। রানীর মত ভাষা জানেনা সে, জানেনা রানীর মত চালচলন। বুড়ি তেড়ে এসে চড় বসিয়ে দিলো বুড়োর গালে। তারপর বললোঃ আমি জমিদারনী, আমার সঙ্গে মুখে মুখে কথা! তোকে যা বল্‌ছি তাই কর।

বুড়ো চলে গেলো সাগরের ধারে। আবার ডাকলো সোনার মাছকে। সাঁতরে কাছে এলো সোনার মাছ। বুড়ো বললোঃ

বুড়ি আমার থাকতে চায় না জমিদারনী। সে হতে চায় একচ্ছত্র রানী। মাছ বললোঃ তাই হবে বুড়ো। ফিরে যাও নিজেরবাড়ি।

বুড়ো ফিরে দেখলো, এযে রাজদরবার। রানী হয়ে বসে আছে বুড়ি। তটস্থ সব আমীর ওমরাহ। চারদিকে কোটাল, কাঁধে উচিয়ে আছে কুঠার। অবস্থা দেখে বুড়ো ভয়ে কাঁপতে লাগলো। পা ছুঁয়ে সালাম করলো মহারানী বুড়িকে। জীর্ন বুড়োকে দেখে ভারী অপমান বোধ করলো বুড়ি। তার ইশারায় বুড়োকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলো কোটালরা। হাসাহাসি করে বললোঃ বুড়োটার সাহসতো কম নয়। এসেছে রানীমার সামনে। বেকুবের উপযুক্ত শিক্ষা হলো।

বুড়ো বাইরে চলে গেল মনের দুঃখে। বাইরে বাইরে লুকিয়ে কাটালো সাতটা দিন।

বুড়ির হুকুমে খুঁজে আনা হলো বুড়োকে। বুড়ি হুকুম দিলো বুড়োকে, যা, আবার গিয়ে মাছকে বলবি, থাকতে চাইনা একচ্ছত্র রানী, হতে চাই সমুদ্রের অধিশ্বরী। সোনার মাছ হবে আমার বাঁদী। খাটবে আমার ফাই ফরমাস।

মুখ ফুটে কিছুই বললো না বুড়ো। চলে গেলো সমুদ্রের ধারে। ডাকলো সোনার মাছকে। সাঁতরে খানিকটা কাছে এসে সোনার মাছ বললোঃ ফের কি চাই তোমার। জবাব দিলো বুড়োঃ কি বলবো ভাই, একচ্ছত্র রানী হয়েও বুড়িটার মিটলোনা আশা। সে হতে চায় সমুদ্রের অধিশ্বরী। আর

তোমাকে বাঁদী রাখতে চায় সে। খাটবে তুমি তার ফাই ফরমাস। মহাসমুদ্রে সে হবে মহা সুখী।

কিছুই বল্‌লোনা সোনার মাছ। লেজটা নেড়ে ডুব দিলো অতল সাগরে। আর ফিরে এলোনা সে। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বুড়ো বাড়ির পথ ধরলো।

বাড়ি ফিরে এলো বুড়ো। কোথায়বা রাজপ্রাসাদ আর কোথায়বা রাজদরবার। দেখতে পেল আবার সেই জরাজীর্ন কুঁড়ে। বুড়ি বসে দরজায়। সামনে তার ভাঙ্গা সেই বারকোশটা।

একজন অকৃতজ্ঞের পরিনাম এমনই হয়ে থাকে।

বাংলার বাঘ

দেশের মানুষ তাঁকে উপাধি দিয়েছিল "বাংলার বাঘ"। সত্যি, তিনি ছিলেন বাঘের মতই সাহসী আর তেজস্বী। বাংলার বাঘের আসল নাম আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করতেন। তিনি তাঁর জুনিয়র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন বাংলার আরেক বাঘ শেরেবাংলা এ, কে, ফজলুল হক সাহেবকে। বাংলার এই দুই বাঘের হুংকারে বৃটিশ সরকারের ভিত কেঁপে উঠেছিল।

এবারে আমরা বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনের একটি বাস্তব ঘটনা তুলে ধরছি।

বৃটিশ সরকারের প্রতাপে তখন বাঘে ছাগে এক ঘাটে পানি খেতো। তাই বলে সবাই বৃটিশ সরকারের বশ্যতা স্বীকার করতো, এমন নয়। বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ইংরেজের অন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে রুখে দাঁড়াতেন।

বৃটিশ আমলে কলকাতার একটি রাস্তা দিয়ে কেবল ইংরেজদের গাড়িই চলতে পারতো। তাদের ভাষায় ভারতীয় কালো আদমীদের চলতে দেয়া হতো না সেই রাস্তা দিয়ে। ভারতীয় নেতারাও মেনে নিয়েছিলেন ইংরেজ সরকারের এই অন্যায়নিয়ম।

একদিন বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় গাড়ি হাঁকিয়ে এগিয়ে গেলেন সেই পথ দিয়ে। ইংরেজ সার্জেন্ট আটকালো তাঁর গাড়ি। জানিয়ে দিলো, এ পথ দিয়ে বাঙালীরা যেতে পারেনা।

আশুতোষ বললেনঃ আমার দেশের পথ দিয়ে আমি যেতে

পারবোনা কেন?

সার্জেন্ট বললোঃ কালো আদমির এ পথ দিয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই।

আশুতোষ রেগে গিয়ে বললেনঃ এ পথ দিয়ে আমি যাবোই। কিছুতেই এই অন্যায় আদেশ আমি মেনে নেবোনা! আজ থেকে আইন আমি বদলে দেবো।

সার্জেন্ট বললোঃ ওপর থেকে যা আদেশ আসে, আমাকে তাই পালন করতে হয়। তা নাহলে আমার চাকুরী যাবে। আপনি যা বলার, ওপরওয়ালাদের বলুন।

আশুতোষ বললেনঃ ডাকো তোমার পুলিশ কমিশনারকে।

সার্জেন্ট গিয়ে সব কিছু খুলে বললো পুলিশ কমিশনারকে। তিনি সার্জেন্টকে বললেনঃ না, এপথ দিয়ে কালো আদমির গাড়ি চলবেনা।

সার্জেন্ট বললোঃ লোকটাকে কিছুতেই ফেরানো যাচ্ছেনা।

এবারে পুলিশ কমিশনার তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেন। সার্জেন্ট কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিচয় জেনে ফিরে এলো। জানালো পুলিশ কমিশনারকে।

কমিশনার বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে চিনতেন। তিনি সার্জেন্টকে বললেনঃ বাধা দিওনা। যেতে দাও তাঁকে। বাধা দিলে লড়াই বাধবে।

সার্জেন্ট ছুটে গিয়ে আশুতোষকে বললেনঃ আপনি এ পথ দিয়ে যেতে পারেন স্যার। আপনাকে না চিনে ভুল করেছি। কিছু মনে করবেন না।

আশুতোষ বললেনঃ হ্যা, আমি এ পথ দিয়েই যাবো। তবে কিছুতেই একা যাবোনা। আমার সঙ্গে যাবে আরো ভারতবাসীর গাড়ি। কালো-ধলো সবাই মানুষ--সবাই সমান। তোমার কমিশনারকে বলো, গভর্নরের অনুমতি আদায় করতে। আমি বসে থাকলাম এখানে।

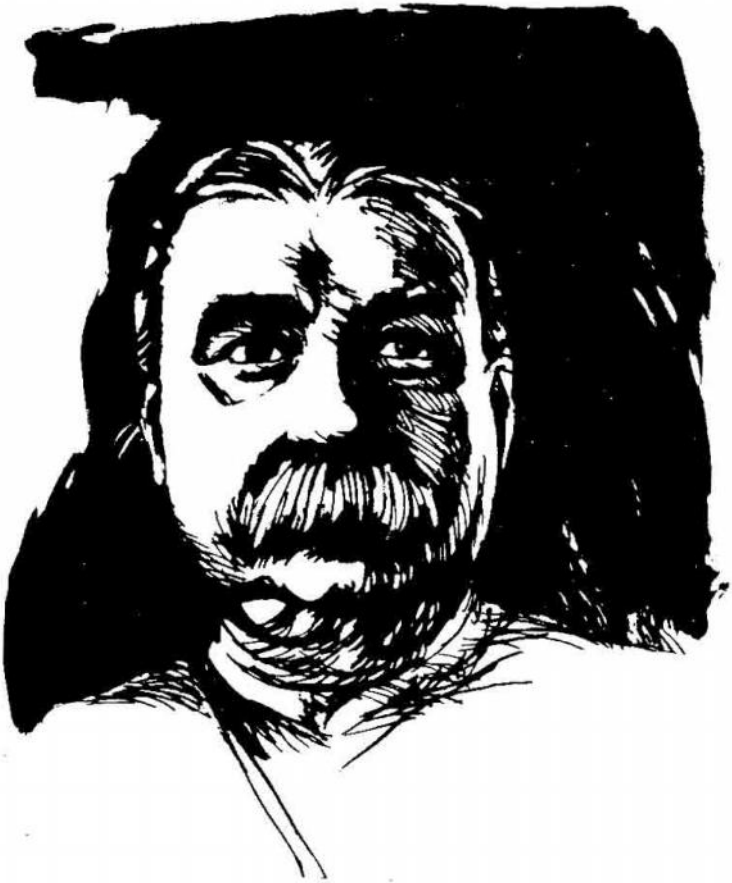

অগত্যা কি আর করা যায়। আশুতোষের আদর্শের কাছে নতি স্বীকার করলেন ইংরেজ গভর্নর। ভারতবাসীর জন্যে খুলে দেয়া হলো সেই রাস্তাটি।

অনেকে হয়তো ভাবছো, আশুতোষের মন ছিল ইস্পাতের মত কঠিন। তা ছিল বৈকি। তবে তাঁর মনটি যে আবার মাটির

মত নরম ছিল, তাও কিন্তু ভুলবার নয়।

একবার এই বাঘ এসেছিলেন আরেক বাঘ শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হকের অঞ্চল বরিশালে। তখন আশুতোষ ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর। তিনি এসেছিলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করার জন্যে। বরিশাল জিলা স্কুল পরিদর্শনের সময় একটা ছোট মাঠ পেরুতে হলো। তখন বৃষ্টি হচ্ছিল টিপ্ টিপ্ করে। আশুতোষের মাথার ওপর ছাতা ধরলেন জিলা স্কুলের প্রধানশিক্ষক। আশুতোষ ছাতাটা কেড়ে নিয়ে প্রধানশিক্ষকের মাথার ওপর ধরলেন। বললেনঃ স্কুলের সীমানায় আপনার চেয়ে বড় আর কে আছে! আপনার সেবা করার সুযোগ দিন। আমি ধন্য হব।

এবারে ভেবে দেখো, তিনি কত মহৎ ছিলেন।

আজব দেশ

এক যে ছিল আজব দেশ। সে দেশে গরুর দাম এক পয়সা, ছাগলের দাম এক পয়সা, হাতির দাম এক পয়সা, মোষের দাম এক পয়সা, মুরগীর দাম এক পয়সা, মুরগীর ডিমের দাম এক পয়সা, রুইমাছের দাম এক পয়সা, পুঁটি মাছের দাম এক পয়সা, ঘিয়ের দাম এক পয়সা, তেলের দাম এক পয়সা, সোনার দাম এক পয়সা, লোহার দাম এক পয়সা। এক কথায় সে দেশে সব জিনিসেরই এক দাম। ঐ এক পয়সা।

সে দেশে বেড়াতে গেলেন এক ব্রাহ্মন। তার সঙ্গে এক শিষ্য। গুরুর আরো অনেক শিষ্য ছিল। তারা বিদেশ ভ্রমনে পথের কষ্ট ও খরচের কথা ভেবে গুরুর সঙ্গী হলো না। কেবল এই শিষ্যটি গুরুর সঙ্গী হলো। এই শিষ্যটি ছিল বোকা। অন্য শিষ্যরা যখন সঙ্গী হতে চায় না, কি আর করা যায়, গুরু এই নির্বোধ শিষ্যকেই সঙ্গে নিলেন।

গুরু তার শিষ্যকে নিয়ে হেঁটে বেড়াতে লাগলেন আজব দেশের বাজারের পথে। তাদের চোখে পড়ে গেলো, সে দেশে গরু এক পয়সা, মুরগী এক পয়সা, রুই মাছ এক পয়সা, পুঁটি মাছ এক পয়সা। বাজারের এই অবস্থা দেখে গুরু ভারী চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন, যে দেশে ছোট বড় ভাল মন্দের বিচার নেই, সেখানে যে বাস করাই সম্ভব নয়।

এমন ধরণের বাজার দর দেখে শিষ্য কিন্তু আনন্দে আটখানা। সে ফুর্তিতে লাফ দিয়ে উঠলো। গুরুকে বললোঃ এত দিন পরে ভাল একটি দেশ পাওয়া গেলো। এবারে মনের

সুখে খাবো আর ঘুরবো।

গুরুর মুখে কিন্তু চিন্তার ছাপ। তিনি ভাবলেন, শিষ্যকে ব্যাপারটা বোঝাতে হবে। তিনি বললেনঃ আরে নির্বোধ, যে দেশে ভাল মন্দের বিচার নেই, সে দেশে থাকা নিরাপদ নয়। চলো, আমরা এখ্খুনি এ দেশ থেকে চলে যাই।

শিষ্য গোঁ ধরে বললোঃ ভাল মন্দের বিচার থাক বা না থাক, তাতে আমাদের কি? আমরা সস্তায় ভাল ভাল খাবো। সুখে শান্তিতে বসবাস করবো। এমন সোনার দেশ ছেড়ে আমি যাবো না গুরু।

শিষ্য কিছুতেই এ দেশ ছেড়ে যেতে চাইলোনা। গুরু যত বোঝায়, শিষ্য তত অবাধ্য হয়। তার ওই এক কথা, এখানে সস্তায় ভাল ভাল খেতে পারবে। এমন সুখের দেশ ছেড়ে চলে

যাওয়াই বোকামী।

গুরু শিষ্যকে অনেক বোঝালেন। শিষ্য সে কথায় আমল দিলোনা। গুরু বললেনঃ তুমি না যাও, আমি কিন্তু চলে যাচ্ছি, বাপু।

শিষ্য বললোঃ আমি একাই থাকতে পারবো, গুরু। আপনি চলেযান।

গুরু মনের দুঃখে শিষ্যকে একা রেখে দূরে কোথাও চলে গেলেন। কিন্তু আজব দেশ ত্যাগ করলেন না। বাপ-মা হারা এই নির্বোধ শিষ্যটিকে গুরু বড়ই স্নেহ করতেন। তাকে বিপদে ফেলে দেশে ফিরতে তার কিছুতেই মন সরছিল না। তিনি কাছেই একটা স্থানে আত্মগোপন করে থাকলেন। কিছুদিনের মধ্যেই ঘটে গেল একটা আজব কান্ড।

সে দেশের রাজকন্যা গেছেন সখিদের নিয়ে নদীতে স্নান করতে। তারা তাদের মূল্যবান গয়না, বদলাবার শাড়ি নদীর কিনারে রেখে মনের সুখে সাঁতার কাটছিল। এক ফাঁকে চুরি হয়ে গেল রাজকন্যার গলার হার, চুড়ি আর যত দামী দামী শাড়ি। চার দিকে হৈ চৈ পড়ে গেলো।

চোরতো আগেই সরে পড়েছে। তবুও চোর ধরতে হবে। নদীর কিনার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল এক পথিক। লোকটা দেখতে এমনই লিক্‌লিকে যেন একগাছা লাঠি। রাজার অনুচরেরা তাকেই চোর বলে ধরে নিয়ে গেলো। লোকটা যতই বলে, আমি চোর নই, আমি পথিক; প্রহরীরা বলে, আবার কথার ওপর কথা, চুরি যদি না করবি তোকে নদীর ঘাটে পাওয়া গেল কেন?

রাজা বললেনঃ পাকা চোর বটে। তাও কিনা আমার কন্যার হার চুরি!

লোকটাকে সবাই ছিঃ ছিঃ করলো। রাজা লোকটার ফাঁসির আদেশ দিলো। ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেয়া হলো

লোকটাকে। কিন্তু একি! লোকটা এতই লিকলিকে যে ফাঁসির দড়িতে তার গলা আটকালোনা। সে পড়ে গেল নীচে। যতবার তাকে ঝোলানো হলো, সে পড়ে গেলো।

এমন কান্ড দেখে রাজা মহা ভাবনায় পড়ে গেলো। সমাধান খুঁজে বের করার জন্যে সভাসদদের আদেশ দিলো। একজন সভাসদ বললোঃ ফাঁসির মাপের সঙ্গে লোকটার গলার মাপের মিল নেই। অতএব লোকটা চোর নয় হুজুর। ওকে ছেড়ে দেয়া হোক।

রাজা আদেশ দিলোঃ তাই হোক। এখ্খুনি ফাঁসির মাপ নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। যার গলার মাপের সঙ্গে ফাঁসির মাপ মিলবে, সেই প্রকৃত চোর।

রাজার আদেশে তার চরেরা ফাঁসীর মাপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। তারা খুঁজে পেলো নাদুস-নুদুস একটি লোককে। মোটাসোটা লোকটার ঘাড় মেপে দেখলো তারা। ফাঁসির মাপের সঙ্গে হুবহু মিলে গেলো। রাজার লোকজন 'পেয়েছি' 'পেয়েছি' বলে চিৎকার করে উঠলো।

শিষ্য কিছুই বুঝতে পারলোনা। রাজার লোকেরা তাকে বেঁধে নিয়ে গেলো রাজদরবারে।

রাজা গম্ভীর কন্ঠে শিষ্যকে বললেনঃ ব্যাটা পামর, তোরতো সাহস কম নয়, তুই আমার মেয়ের হার চুরি করেছিস্।

শিষ্য বললো ঃ আমি হার চুরির কিছুই জানিনা মহারাজ। আমি নিরপরাধ বিদেশী মানুষ।

রাজা রেগে বললোঃ তুই যদি হার চুরি না করবি, ফাঁসির মাপের সঙ্গে তোর গলার মাপ মিলে গেল কেন? ব্যাটা, তুই আসল চোর। তোকে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে।

শিষ্য যতই নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করতে চায়, রাজা ততই রেগে যায়। অবশেষে শিষ্যের ফাঁসির আদেশ হয়ে গেলো।

শিষ্য দেখলো তার বাঁচার কোন উপায় নেই। সহসা তার মনে পড়ে গেলো গুরুর কথা। গুরুতো আগেই বলেছিলেন, এ দেশে থাকা যায় না। শিষ্য গুরুর কথা স্মরণ করে কাঁদতে লাগলো। রাজাকে বললোঃ মহারাজ, আমার একজন গুরু আছেন। মরার আগে আমার গুরুকে একবার দেখতে চাই।

গুরু লোকজনের ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন। চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন নির্বোধ শিষ্যের শোচনীয় অবস্থা। বুদ্ধিমান গুরু ইতিমধ্যেই শিষ্যকে বাঁচানোর কৌশল বের করলেন। তিনি রাজাকে প্রণাম করে বল্‌লেনঃ মহারাজ, আপনার মত ন্যায় বিচারক রাজা পৃথিবীতে দু'জন নেই। আপনি চোরটির যে বিচার করেছেন, নিসন্দেহে তা ন্যায় বিচার। তবে--

নীরবে দাঁড়িয়ে থাকলেন গুরু। রাজা তার অসম্পূর্ণ কথাটি শোনার জন্যে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকলেন। কিছুক্ষণ পর বললেনঃ কি হে, বলছোনা কেন? কি হলো?

গুরু বললেনঃ মহারাজ, এটা হচ্ছে মাহেন্দ্রক্ষণ। পবিত্র মুহূর্ত। এসময় যে ফাঁসিতে ঝুলবে, তার হবে নিশ্চিত স্বর্গলাভ। আমি ভাবছি একটা জঘন্য চোর কিনা স্বর্গবাসের সুযোগ পাবে। সারাজীবন ধর্মকর্ম করে আমি কিনা এই সুযোগ পাবোনা! মহারাজ, আমাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিন।

মন্ত্রী ঝট করে সামনে এগিয়ে এসে বললেনঃ মহারাজ, আমি থাকতে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলবে ওই ভিখিরি সন্ন্যাসীটা! তা হবে না ধর্মাবতার। ফাঁসিকাষ্ঠে আমিই ঝুলতে চাই। আমাকে সুযোগ দিতে আজ্ঞা হোক, মহারাজ।

মন্ত্রীর কথা শুনে রাজা রাগে ফেটে পড়লো। বল্‌লোঃ ব্যাটা স্বার্থপর, তোর আস্পর্ধাতো কম নয়। আমার ফাঁসিকাষ্ঠে

চড়ে তুই স্বর্গে যাবি, আর আমি কি তাই চেয়ে চেয়ে দেখবো? আমি নিজেই ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলে স্বর্গে যাবো।

রাজার আদেশে ফাঁসির আয়োজন করা হলো। রাজা নিজেই ফাঁসিতে ঝুলে স্বর্গে গেলো।

শিষ্য ছাড়া পেয়ে গুরুর সাথে পথ চললো। এবারে সে বুঝতে পারলো, যে দেশে ভাল মন্দের বিচার নেই, সেখানে বাস করা যায় না।

(বাংলাদেশ)

দিল যার দরিয়া

রয়েল বেঙ্গল টাইগারের দেশ বাংলাদেশ। এ দেশের মানব সমাজেও জন্ম নিয়েছিলেন সুন্দর বনের বাঘের মত তেজস্বী এক মহাপুরুষ--নাম তাঁর শেরেবাংলা এ, কে ফজলুল হক। প্রকৃতির আদরের সন্তান এ, কে, ফজলুল হক অবারিত মাঠে ছুটাছুটি করে, বন-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে, উত্তাল নদীর বুকে সাঁতার কেটে একটি মুক্ত বাঘের মতই বেড়ে উঠেছিলেন শৈশব থেকে। এই বাঘ তাই ভয় করতেন না কুমিরকে। একদিকে কুমিরের আনাগোনা, আরেক দিকে সাঁতার কাটতেন বাংলার বাঘ ফজলুল হক। নদীতে তাঁর এই সাঁতার কাটার ঘটনাই প্রমাণ করেছিল, এই ছেলে একদিন দুর্জয় সাহস দিয়ে বিরোধী শক্তিকে হার মানাবে।

পিতা ওয়াজেদ আলী নদীতে সাঁতার কাটার এই ঘটনা নিয়ে মাঝে মাঝে রাগ করে বলতেনঃ এই ছেলে এক দিন কুমীরের পেটেই চলে যাবে।

মাতা বেগম সৈয়দুন্নেছা স্বামীকে সাহস দিয়ে বলতেনঃ আমার ফজলুকে কুমীরে খেতে পারবেনা। আমার ছেলে বড় হয়ে কুমীর তাড়াবে।

মায়ের এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল। এই কিশোর একদিন বড় হয়েছিলেন। বাঘের মত দুর্জয় সাহসী হয়েছিলেন। এই বাঘের গর্জনে সেদিন কেঁপে উঠেছিল বিদেশী বেনিয়া বৃটিশ কুমীর। এই বাঘই একদিন খালি হাতে ইংরেজের কামানের সামনে বুক পেতে দিয়েছিলেন। বলেছিলেনঃ সাহস থাকেতো আমার বুকের ওপর কামান চালাও বৃটিশ সরকারের সৈন্যরা সেদিন বাংলার বাঘের সামনে

কামান চালাতে সাহস পায়নি। জনগণের মিছিলেরই জয় হলো। এই মিছিলের ওপর গুলি ছোঁড়ার জন্যে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা প্রত্যাহার করা হলো। হজরত মুহম্মদ (সঃ) এর চরিত্র সম্পর্কে অপব্যাখ্যা করে একজন পাদ্রী যে নিবন্ধ রচনা করেছিল, তার প্রতিবাদে এই মিছিল বের করা হয়েছিল।

আমাদের দেশে মেধাবী ছাত্রের অভাব নেই। প্রতিবছর উচ্চতর শিক্ষা ক্ষেত্রে ভাল ফল করে অনেকেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পত্রিকায় ফলাও করে তাদের খবর ও ছবি ছাপা হয়। দু'দিন বাদে তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা শিক্ষা লাভ করেন ভালভাবে খেয়ে পড়ে বাঁচার জন্যে। সংসারে সুখী হওয়ার জন্যে। কেবল অর্থ ও সম্পদ জমানোই তাদের লক্ষ্য। কিন্তু ফজলুল হক? তিনি ছিলেন সমাজদরদী। সব সময়ই তিনি সমাজের অবহেলিত মানুষের পাশে দাঁড়াতেন।

একবারের কথা বলছি। ফজলুল হক তখন বরিশাল পড়াশোনা করতেন। কোনো এক ছুটিতে তিনি ফিরছিলেন গ্রামের বাড়ি চাখারে। পথে দেহের গতি নামক একটি গ্রামে লোকজনের জটলা দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। দেখতে পেলেন, জমিদারের লোকেরা দেনার দায়ে এক গরীব কৃষকের বাড়িতে এসেছে ক্রোক করতে। তারা একে একে গরীব কৃষকের স্থাবর অস্থাবর জিনিসপত্র দখল করেছে। কৃষকের ছেলেটি তার প্রিয় কাঁসার থালাটি বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। পেয়াদা থালাটি ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। শিশুটিকে ধমক দিচ্ছে, মারের ভয় দেখাচ্ছে।

ফজলুল হকের হৃদয় কেঁদে উঠলো এই দৃশ্য দেখে। তিনি

নায়েবের হাতে জমিদারের খাজনা বাবদ বিশ টাকা তুলে দিলেন। গরীব কৃষকটি দেনার দায় থেকে মুক্ত হলেন। থালাটি ফেরত পেয়ে হাসি ফুটে উঠলো ছেলেটির মুখে।

এক ব্রাহ্মণ স্কুল শিক্ষক। টাকার অভাবে চার চারটি বিয়ের যুগ্যি মেয়েকে বিয়ে দিতে পারছেন না। সাহায্য চাইতে এলেন হক সাহেবের কাছে। হক সাহেব ব্রাহ্মন স্কুল-শিক্ষককে সাহায্য করার আশ্বাস দিলেন। আরেক দিন আসার জন্যে বলে দিলেন।

ফজলুল হক তখন হাইকোর্টের জাদরেল আইনজীবী। তিনি নিজের চেম্বারে বসে ভাবছিলেন সেই ব্রাহ্মনের কথা। তাঁর হাতে তখন মোটেও টাকা-পয়সা ছিলনা। তিনি তো টাকা পয়সা জমিয়ে রাখেন না! যেমন আয় হয়, খরচও হয় দেদার। গরীব দুঃখীদের দান করেন--দরকার হলে ঋণ করেন। সেদিনও ভাবছিলেন মক্কেল এলে টাকা পেয়ে প্রথমেই সাহায্য করবেন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে। দরকার হলে ঋণ করেও ব্রাহ্মণকে সাহায্য করতে হবে। এমন সময় চেম্বারে ঢুকলেন এক ব্যবসায়ী বন্ধু। তিনি ফজলুল হকের কাছ থেকে তার পাওনা টাকা চাইতে এসেছেন। উল্টো ফজলুল হকই চেয়ে বসলেন ব্যবসায়ী বন্ধুটির কাছে। বললেনঃ এক কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণকে সাহায্য করতে হবে, আরো কিছু টাকা ধার দাও।

ব্যবসায়ী বন্ধুটি বললেনঃ ব্রাহ্মণকে সাহায্য আপনি করতে যাবেন কেন? সমাজে কি অবস্থাপন্ন হিন্দুরা নেই?

ব্যবসায়ী বন্ধুটি নিজের পাওনা টাকা না পেয়ে খানিকটা ব্যথিত হলেন। হক সাহেব কিন্তু ভেবেই চল্‌লেন সেই ব্রাহ্মণের কথা। তাঁর কাছে যে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ নেই। এমন সময় পর্দা ঠেলে ঢুকলেন একজন মক্কেল। একটি

গুরুত্বপুর্ণ মামলার জন্যে হক সাহেবের হাতে তুলে দিলেন পাঁচশ' টাকা। অবশিষ্ট টাকা পরে দেয়ার ওয়াদা করে মক্কেল ভদ্রলোক চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর চেম্বারে এলেন সেই ব্রাহ্মণ শিক্ষক। ফজলুল হক শিক্ষকের হাতে পাঁচশ' টাকা তুলে দিয়ে বললেনঃ একজন মক্কেল দিয়ে গেলো। নিন এই পাঁচশ' টাকা। আপনার মেয়ে বিয়ে দিন।

ব্রাহ্মণ শিক্ষক হক সাহেবের বদান্যতা দেখে কেঁদে ফেললেন। বার বার সালাম করে টাকা নিয়ে বিদায় হলেন।

ফজলুল হক দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। নিজ গ্রাম চাখারে তিনি কলেজ স্থাপন করেছেন। মুন্সিগঞ্জের হরগঙ্গা কলেজও তাঁরই সৃষ্টি। টাকার অভাবে কোন ছাত্রের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাবে কিংবা পরীক্ষায় অংশ নেয়া সম্ভব হবে না--এটা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারতেন না। তিনি বহু ছাত্রের পড়াশোনার খরচ দিয়েছেন, পরীক্ষার ফিস দিয়ে সাহায্য করেছেন।

একটি ছেলে এলো হক সাহেবের কাছে সাহায্য চাইতে। ছেলেটি পরীক্ষা দেবে, ফিসের টাকা নেই। হক সাহেবের হাতও খালি। তিনি ছেলেটিকে কিছুই দিতে পারলেন না। কেবল দুঃখ করে বললেনঃ তুমি এমন সময়ই এলে, যখন আমার হাতে কিছুই নেই। তোমার উপকার করতে পারলামনা বলে আমি দুঃখিত।

ছেলেটি টাকা না পেয়ে নীরবে চোখ মুছতে মুছতে বাইরে গেলো। তার যে পরীক্ষার টাকা জমা দেয়ার আজই শেষ দিন।

ছেলেটির দুঃখে ফজলুল হকও কাঁদলেন। এমন সময় একজন মক্কেল এলেন। শেরে বাংলা খুশীতে লাফিয়ে উঠলেন। খোঁজ নিলেন মক্কেলের কাছে টাকা আছে কিনা। মক্কেল জানালেন তার কাছে টাকা আছে। শেরে বাংলা বললেনঃ তাহলে এই মাত্র যে ছেলেটা নেমে গেলো, তাকে ডেকে আনোতো ভাই।

মক্কেল তাই করলেন। শেরে বাংলা মক্কেলের কাছ থেকে নিয়ে ছেলেটির হাতে তুলে দিলেন পরীক্ষার ফিস ষাটটি টাকা।

ছেলেটি যেমন টাকা না পেয়ে কাঁদছিল, এবার টাকা পেয়ে আরো কাঁদলো। সেই কান্না এলো মহান হৃদয়ের পরশ পেয়ে। সেই কান্না আনন্দের --সুখের।

শেরে বাংলার সারা জীবনের বদান্যতার কাহিনী লিখতে গেলে মোটা একখানা বই হয়ে যাবে। এখানে কেবল দু'একটি উদাহরণ তুলে ধরা হলো।

ফজলুল হক এদেশের সমাজ সংস্কার, রাজনীতি ও শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অনেক অবদান রেখে গেছেন। সাহিত্য ও সংবাদিকতার ক্ষেত্রে তিনি যা করেছেন, তাও জাতি চিরদিন স্মরণ রাখবে।

তিনি কবি সাহিত্যিকদের সাহায্য করেছিলেন। সাহিত্য সংগঠনকে সাহায্য দিয়ে বাঁচিয়ে রেখে ছিলেন। সরাসরি সাহায্য দিয়ে পত্রিকাও বের করেছিলেন।

তখনও ফজলুল হক শেরে বাংলা হননি। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিখ্যাতিও তেমন একটা ছড়িয়ে পড়েনি। একদিন পরবর্তীকালের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মোজাফফর আহমদ নজরুল ইসলামকে নিয়ে ফজলুল হক সাহেবের বাসায় গেলেন। এই দুই তরুণের উদ্দেশ্য, তাঁরা একটি সাহিত্য পত্রিকা বের করবেন। ফজলুল হককে জানানো হলো কথাটি। তিনি রাজী হলেন, কিন্তু জিজ্ঞেস করলেনঃ সম্পাদকীয় লিখবে কে?

মোজাফফর আহমদ বললেনঃ আমরাই লিখবো।

হক সাহেব বললেনঃ আমরাটা কে? তার চেয়ে পাঁচ কড়িকে দিয়ে লিখিয়ে নিও।

মোজাফফর আহমদ বললেনঃ নজরুল ইসলাম সম্পাদকীয় লিখবে।

হক সাহেব বললেনঃ সে আবার কে?

মোজাফফর আহমদ নজরুলকে দেখিয়ে দিলেন। হক সাহেব ভাবলেন, দেখাই যাকনা ছোকরা কি লেখে।

পত্রিকা বের করা হলো। নাম 'নবযুগ'। কাজের বেলা দেখা গেলো কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদকীয় আর কবিতা সাড়া জাগিয়েছে গোটা দেশে। পত্রিকাটি বাজারে চলছে বেশ।

পত্রিকাটি যৌথভাবে সম্পাদনা করতেন নজরুল ইসলাম আর মোজাফফর আহমদ। হক সাহেব তাঁদের কাজ দেখে খুশী হলেন।

আরেকবার কি হলো, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অবস্থা কাহিল হয়ে পড়লো। সমিতির ঘরভাড়া পর্যন্ত দেয়া যাচ্ছেনা। মুসলমান কবি-সহিত্যিকরা কী করবেন ভেবে অস্থির হয়ে উঠলেন। অবশেষে তাঁরা ছুটে গেলেন হক সাহেবের বাসায়। তাঁরা দেখলেন, পাওনা টাকা আদায়ের জন্যে দু'জন পাওনাদার কাবুলীওয়ালা বসে আছে দরজায়। তাদের মন ভেঙ্গে গেলো। তাঁরা ভাবলেন, কাবুলীওয়ালার টাকা না দিয়ে হক সাহেব কি অন্য কোথাও টাকা দিতে পারবেন। তাঁরা হক সাহেবকে বঙ্গীয় মুসলমান সমিতির আর্থিক সংকটের কথা খুলে বললেন। হক সাহেব জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের হাতে কত টাকা আছে।

তাঁরা বললেনঃ পঞ্চাশ টাকা।

শেরে বাংলা জিজ্ঞেস করলেনঃ কত টাকা দরকার?

তাঁরা বললেনঃ আরো তিনশ' টাকা।

এমন সময় একজন মক্কেল এলেন। তার মামলাটি জটিল। হক সাহেবের হাতে পাঁচশ টাকা তুলে দিলেন সেই মক্কেল। হক সাহেব গুণে গুণে তিনশ' টাকা তুলে দিলেন সাহিত্যিকদের প্রতিনিধি আবুল মনসুর আহমদের হাতে। এ ভাবেই সেদিন বেঁচে গেলো বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি।

একজন দিল-দরিয়া মনীষীর পক্ষেই এমন দান করা সম্ভব।

বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি

একজনের বিশ্বাসকে পুঁজি করে তার সর্বনাশ করার ঘটনা অনেক আমরা শুনেছি। যাকে বলে বিশ্বাসঘাতকতা। মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় রাজ্য হারালেন, নিহত হলেন নবাব সিরাজদ্দৌলা। দেশে দেশে অমন বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী অনেক আছে। বিশ্বাসঘাতক কোন দিনই ক্ষমা পায় না, তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হয়-- এটাই ইতিহাসের শিক্ষা।

অনেক বছর আগের কথা। এগারো শ' বছরেরও বেশী হবে। বাগদাদের খলিফা ছিলেন আল-মুতাসিম বিল্লাহ। তিনি ছিলেন যেমন প্রজাদরদী, তেমন বিদ্যানুরাগী।

একদিন খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ বাগদাদের রাস্তায় বেড়াতে বেরুলেন। বিশাল রাজকীয় শোভাযাত্রা এগিয়ে চললো সামনে। এমন সময় এক বুড়ো যাচ্ছিল গাধায় চড়ে। সে গাধাসহ পড়ে গেলো রাস্তার পাশে একেবারে নালায়। নালাটি ছিল পুতিগন্ধময়--নর্দমা আর আবর্জনায় ঠাসা। বুড়ো লোকটা সেই নর্দমায় হাবুডুবু খেতে লাগলো। খলিফা লোকটাকে বাঁচানোর জন্যে ঘোড়া থেকে নেমে সেই নালায় ঝাঁপ দিলেন। তাঁর মূল্যবান রাজকীয় পোষাক ভরে গেলো কাঁদা আর আবর্জনায়। লোকটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ওপরে উঠলেন তিনি। বলতে পারো, এমন প্রজা দরদী ক'জন আছেন? হ্যা, এমন দরদী খলিফাকেও অত্যাচারীর হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। তিনি হয়েছিলেন বিশ্বাসঘাতকতার শিকার। তাহলে সত্য ঘটনাটি খুলেই বলা যাক।

খলিফা মুতাসিম বিল্লাহর উজির ছিলেন আহমদ। তিনি

ছিলেন লোভী ও অসৎ প্রকৃতির। মুখে তিনি মিষ্টি কথা বলতেন, কিন্তু মনটি ছিল সাপের মতই বিষাক্ত। কি করে খলিফাকে সরিয়ে নিজেই সাম্রাজ্যের বাদশাহ হবেন, এটাই ছিল তার একমাত্র চিন্তা। দিনরাত তিনি সুযোগও খুঁজতে লাগলেন।

মুতাসিম বিল্লাহর সুশাসনে প্রজারা সুখে শান্তিতেই বসবাস করছিল। সবার মুখেই খলিফার তারিফ। আহমদের সুযোগ আর জোটে না।

একটি বিরাট সাম্রাজ্যে কত কিছুই না ঘটে। দেশের একটি এলাকায় শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেলো। তোমরা জানো, মুসলমানরা শিয়া আর সুন্নী দু'টি ভাগে বিভক্ত। খলিফা ছিলেন সুন্নী আর উজির আহমদ ছিলেন শিয়া। শিয়ারা বলে, আমরাই শ্রেষ্ঠ; সুন্নীরা বলে, আমরা। এভাবে দুই সম্প্রদায়ে দাঙ্গা বাধলো। উজির আহমদ এবারে সুযোগ পেয়ে গেলেন। তিনি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উস্কানী দিলেন। প্রচার করে বেড়ালেন, খলিফা মুতাসিম বিল্লাহর রাজ্যে শান্তি নেই, সুশাসন নেই, জান মালের নিরাপত্তা নেই।

আহমদ কেবল অপপ্রচার করেই ক্ষান্ত হলেন না। তিনি যোগাযোগ করলেন যাযাবর মঙ্গোল সরদার হালাকু খানের সঙ্গে। হালাকু খান ছিলেন মধ্য এশিয়ার ত্রাস। তাঁর নাম শুনলেও মানুষ আতংকে দিশাহারা হয়ে ওঠে। তার অধীনে বিপুল সংখ্যক পদাতিক সৈন্য। রাজ্য বিস্তারের জন্যে অগ্নি সংযোগ, নির্বিচারে হত্যা, লুট--হেনকাজ নেই, যা তিনি করতে পারেন না।

উজির আহমদ হালাকু খানকে বললেনঃ দেশে বিশৃঙ্খলা। আপনি বাগদাদ আক্রমন করুন। আমি আছি আপনার সঙ্গে।

আমি থাকতে আপনার কোন অসুবিধা হবেনা।

হালাকু খান এমন সুযোগ হাতছাড়া করলেননা। উজির আহমদের সহযোগিতায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন বাগদাদের ওপর। মুতাসিম বিল্লাহ ভাবতেও পারেননি এমন ঘটনা ঘটবে। তবুও হালাকু খানের মোকাবেলা করলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। দু'দলেই বিপুল হতাহত হলো। শেষ পর্যন্ত জয় হলো হালাকু খানের। পতন ঘটলো বাগদাদের। নিষ্ঠুর হালাকুর হাতে প্রাণ দিলেন মুতাসিম বিল্লাহ।

হালাকুর সৈন্যরা বাগদাদে ধ্বংসলীলা চালালো। সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র সকল গ্রন্থাগার আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিলো। সারা নগরী জুড়ে চললো রক্তের হোলি খেলা। মুতাসিম বিল্লাহর প্রাণপ্রিয় বাগদাদের পতন ঘটলো মর্মান্তিকভাবে।

এবারে এলো উজির আহমদের পালা।

দিনরাত তার একই ভাবনা, কখন বাগদাদের গভর্ণর হবেন। অধীর আগ্রহে তিনি হালাকু খানের ডাকের অপেক্ষা করতে থাকলেন। একদিন ডাক এলো। একজন প্রহরী এসে কুর্নিশ করে জানালোঃ বাদশাহ হালাকুখান আপনাকে সালাম জানিয়েছেন।

আনন্দের ঢেউ খেলে গেলো আহমদের বুকে। তিনি প্রহরীকে অপেক্ষা করতে বললেন। সময় নষ্ট না করে ভাল ভাল পোষাক পরলেন। জরির তাজ, মখমলের চোগা-চাপকান আর কিংখাবের জুতো পরলেন। খুশ্‌ব ছড়ানো আতর লাগালেন গায়ে। অনেক স্বর্ন মুদ্রা বকশিস দিলেন প্রহরীকে। তেজি আর সুন্দর গোড়ায় চড়ে টগবগিয়ে ছুটলেন হালাকু খানেরতাঁবুতে।

শক্তিমত্ত হালাকু খান বসে আছেন সিংহাসনে। আহমদ কুর্নিশ করে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে। হালাকু খান গুরু গম্ভীর

কন্ঠে প্রশ্ন করলেনঃ আপনি কি আমার অধীনে চাকরী কতে চান, উজির আহমদ।

আহমদতো এই প্রশ্নটিই শুনতে চেয়েছিলেন। তিনি খুশীতে গদগদ হয়ে বললেনঃ জ্বি, জাঁহাপনা। এই অধম বান্দাকে যদি আপনার সেবার সেই সুযোগ দেন--

হালাকু খান আবার প্রশ্ন করলেনঃ বাগদাদের গভর্নর হতে চান আপনি?

আহমদ এবারে খুশীতে বাগ বাগ হয়ে বললেনঃ জাঁহাপনা, আপনার ইচ্ছে-- অধীন আপনার নেক নজর চায়।

হালাকু খান ভাল করে চেয়ে দেখলেন আহমদকে। তারপর

বললেনঃ ভাল কথা, আপনিতো অগাধ ধন–সম্পদের মালিক -- এতসব ধন–দৌলত পেলেন কোথায়?'

আহমদ একটু মুচকি হাসতে চেষ্টা করলেন। বললেনঃ জাঁহাপনা, বিষয় সম্পতি যা কিছু -- সব মুতাসিম বিল্লাহর আমলেই করেছি।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে আহমদের মুখের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন হালাকু খান। তারপর বাঘের মত গর্জন করে বললেনঃ বিশ্বাসঘাতক, বেঈমান -- তুমি এসেছ আমার দরবারে চাকরী নিতে! কে আছিস্, এই নেমক–হারামকে নিয়ে যা--

তলোয়ার হাতে দু'জন মঙ্গোল সেপাই এলো। কুর্নিশ করে দাঁড়ালো হালাকু খানের সামনে।

হালাকু খান হুকুম করলেনঃ বিশ্বাসঘাতকটাকে নিয়ে যা -- গাছের ডালে ঝুলিয়ে এক কোপে খতম করে দিবি।

আকুল কেঁদে হালাকু খানের পায়ে পড়তে গেলেন আহমদ। প্রহরীরা আর সে সুযোগ দিলোনা। দু'জন আহমদকে টানতে টানতে নিয়ে গেলো তাঁবুর বাইরে। ঝোলালো গাছের ডালে। তারপর ঘ্যাচাৎ করে এক কোপে কেটে ফেললো আহমদকে।

বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত শাস্তি হলো।

লোভী শিয়াল

এক যে ছিল শিয়াল। সে ছিল খুব লোভী। কখন কার মুরগীর বাচ্চা, ছাগলের বাচ্চা চুরি করে মজা করে খাবে এই ছিল তার চিন্তা–ভাবনা।

একদিন ঘরে বসে শিয়াল ভাবছিল কেমন করে খাবার জোগাড় করবে, কোথায় যাবে – সে সব কথা। এমন সময় তার সামনে দিয়ে কয়েকটি মৌমাছি উড়ে বেড়াচ্ছিল। শিয়াল কি মনে করে একটি মৌমাছি ধরে ফেললো। তারপর মৌমাছিটিকে বস্তায় পুরে নিলো। বস্তাটা কাঁধে করে বেরিয়ে পড়লো বাইরে।

পথ চলতে চলতে শিয়াল এসে থামলো এক বুড়ির বাড়ির সামনে। বুড়ি ছিল কালো। তাই তাকে সবাই কালো দাদী বলে ডাকতো। শিয়াল বুড়িকে সালাম জানিয়ে বললোঃ কালো দাদী, আমি তোমার এখানে বস্তাটা রেখে যেতে চাই। কিছুক্ষণ পর নিয়ে যাবো।

কালো দাদী বল্‌লোঃ যাওনা, অসুবিধা নেই।

শিয়াল বস্তাটি রেখে গান গাইতে গাইতে চলে গেলো।

বস্তায় কি আছে দেখার জন্যে বুড়ির ভারী কৌতুহল হলো। সে চুপি চুপি বস্তার মুখ খুলে ফেললো। অমনি মৌমাছিটা ভোঁ করে উড়ে গেলো। বুড়ি হায় হায় করে উঠলো। চেষ্টা করেও মৌমাছিটা ধরতে পারলোনা।

কতক্ষণ পর শিয়াল ফিরে এলো। বস্তাটা খুলে মৌমাছিটা দেখতে পেলনা। সে রেগে বুড়িকে জিজ্ঞেস করলোঃ আমার মৌমাছি কই, দাদী?

বুড়ি বললোঃ বস্তায় কি আছে একটু দেখতে চেয়েছিলাম দাদু। খুলতেই মৌমাছিটা উড়ে গেলো।

শিয়াল জোর গালায় বললোঃ বেশ তো, কি করবে করো। এখন আমার ক্ষতিপূরণ দাও।

বুড়ি বললোঃ তুমি কি চাও বাছা।

এমন সময় একটা মোরগ উঠানে ঘুর ঘুর করছিল। শিয়াল ওটাকে খপ্ করে ধরে বস্তায় পুরলো। তারপর বুড়িকে বললোঃ আমার মৌমাছির বদলে এটাকেই নিয়ে চল্লাম।

বুড়ি বললোঃ আমার দামী মোরগটা নিয়ে যাস্নে বাছা।

শিয়াল কোন কথাই শুনলোনা। মোরগসহ বস্তাটা নিয়ে সে হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেলো বাড়ি থেকে।

শিয়াল হাঁটতে হাঁটতে উঠলো গিয়ে আরেক বুড়ির বাড়িতে। এই বুড়ির গায়ের রং ছিল লাল। তাই তাকে সবাই লাল বুড়ি বলে ডাকতো। শিয়াল তাকে সালাম জানিয়ে বললোঃ লাল দাদী, আমার একটু কাজ আছে, বাইরে যাবো। এই বস্তাটা তোমার এখানে রেখে যেতে পারি?

বুড়ি বললোঃ যাওনা, এটা আবার অমন করে বলার কি হলো।

শিয়াল বল্লোঃ একটু দেখে শুনে রেখো দাদী। ভেতরের মাল যেন খোয়া না যায়।

শিয়াল চলে গেলো। বুড়ি ভাবলো, নিশ্চয়ই বস্তার মধ্যে কোন দামী জিনিস আছে। সে খুলে দেখতে চাইলো। যেইনা বস্তার মুখ খুলেছে, অমনি মোরগটা এক লাফে ছুটে পালালো। বুড়ি অনেক চেষ্টা করেও মোরগটা ধরতে পারলোনা।

কিছুক্ষণ পর শিয়াল এসে বস্তা হাতে নিলো। দেখতে পেলো মোরগ নেই। সে চড়া গলায় লাল বুড়িকে জিজ্ঞেস করলোঃ আমার মোরগ কোথায়?

বুড়ি বললোঃ তোমার বস্তায় কি আছে একটু দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মুখ খুলতেই কি যে হয়ে গেলো দাদু।

শিয়াল বল্‌লোঃ কি আর হবে, আমার দামী মোরগটা খোয়ালে। এখন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তা না হলে আমি ছাড়বোনা কিন্তু।

বুড়ি কেঁদেকেটে বললোঃ আমি গরীব এক বুড়ি, কিইবা আমার আছে ভাই।

এমন সময় বুড়ির ঘরের সামনে তার একটা ছাগলছানা দেখা গেলো। শিযাল ছাগলছানাটা ধরে বস্তায় পুরলো। তারপর ধাঁ করে পথ চললো। বুড়ির কোন অনুনয় বিনয় কানে তুললো না।

আবার পথ চললো শিয়াল। এবারে দাঁড়ালো এসে আরেক বুড়ির বাড়ির সামনে। এই বুড়ির গায়ের রং ছিল হলদে।

তাকে সবাই হলদে দাদী বলে ডাকতো। শিয়াল হলদে দাদীকে সালাম জানিয়ে বললোঃ দাদী, আমাকে এক জায়গায় একটু যেতে হবে। আমার এই বস্তাটা তোমার বাড়িতে একটু রাখতে দাও।

বুড়ি বললোঃ অবশ্যই, এটা কি একটা বলার ব্যাপার হলো। রেখে গেলেইতো হয়।

শিয়াল বললোঃ হ্যা, ভারী দামী জিনিস, একটু দেখে রেখো।

শিয়াল বস্তা রেখে চলে গেলো।

হলদে বুড়ি বস্তাটা খুলে দেখার আগ্রহ চেপে রাখতে পারলোনা। সে যেইনা বস্তাটা খুললো, অমনি ছাগলের ছানাটা ছুটে পালালো। পলকের মধ্যে ঘটনাটা ঘটে গেলো। বুড়ি ছাগলটাকে ধরতে পারলোনা।

একটু পরেই শিয়াল এসে হাজির হলো। বস্তায় ছাগলের ছানা দেখতে না পেয়ে রেগে গেলো সে। তারপর ক্ষতিপূরণ হিসেবে হলদে বুড়ির নাতিটাকে ধরে নিয়ে গেলো।

বুড়ি অনেক কান্নাকাটি করলো, শিয়াল তা কানে তুললোনা।

বস্তা কাঁধে হাঁটতে হাঁটতে শিয়াল গিয়ে আরেক বুড়ির বাড়িতে হাজির হলো। গায়ের রং সাদা বলে এই বুড়িকে সবাই সাদা দাদী বলে ডাকতো। সে তার নাতিদের জন্যে পিঠা বানাচ্ছিল। শিয়াল তার বাড়িতে বস্তাটি রাখতে চাইলো। বুড়িও সহজেই অনুমতি দিলো। শিয়াল রেখে গেলো বস্তাটি। কাজের ছুঁতো ধরে বেরিয়ে গেলো বাইরে। যাওয়ার সময় সাবধান করে দিয়ে গেলো, বস্তাটি যেন খোলা না হয়।

এমন সময় বুড়ির নাতিরা চেঁচিয়ে বললোঃ দাদী, আমাদের পিঠা দাও। ক্ষিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে।

পিঠার গন্ধ পেয়ে বস্তার ভিতর থেকে হলদে বুড়ির নাতিটাও বল্‌লোঃ আমিও পিঠা খাবো। আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে।

বস্তার মধ্যে মানুষের কথা শুনে অবাক হয়ে গেলো সাদা বুড়ির নাতিরা। তারা সাদা বুড়িকে তাজ্জব খবরটা জানালো। সাদা বুড়ি ছুটে এসে বস্তার মুখ খুলে দিলো। বস্তা থেকে বেরিয়ে এলো ফুটফুটে সুন্দর একটি ছেলে। সে কেঁদেকেটে সাদা বুড়িকে বললোঃ শিয়াল আমাকে চালাকী করে ধরে নিয়ে এসেছে। সে আমাকে খেয়ে ফেলবে। আমাকে বাঁচাও।

বুড়ির দয়া হলো। সে বস্তার মধ্যে তার শিকারী কুকুরটা ঢুকিয়ে দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিলো। ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখলো হলদে বুড়ির নাতিটাকে।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এলো শিয়াল। সে দেখলো তার বস্তা ঠিকই আছে। আগের মত ভারী লাগছে। পথ চলতে চলতে সে মনে মনে ভাবলো, আর কি, এখ্‌খুনি মানুষের কচি মাংস খাওয়া যাবে। ক্ষিদে লেগেছেও বেশ। নির্জন বনের ধারে এসে বস্তাটা খুললো সে। অমনি বাঘের মত বেরিয়ে এলো শিকারী

কুকুর। ঘাড় মটকে ধরলো শিয়ালের। অনেক অনুনয় বিনয় করলো শিয়াল। কুকুর তা শুনলোনা। তাকে টুকরো টুকরো করে কামড়ে খেয়ে ফেললো। এভাবেই মৃত্যু হলো লোভী শিয়ালের।।

(বৃটেন)

মহানুভব কথাশিল্পী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আমরা একজন বিশিষ্ট কথাশিল্পী হিসেবেই জানি। তিনি যে একজন গায়ক, রাজনীতিক, সমাজসেবক ও দাতা ছিলেন, তা অনেকের কাছেই অজানা রয়ে গেছে।

এফ. এ. পরীক্ষায় মাত্র বিশ টাকা ফি দিতে না পারায় যার পরীক্ষা দেয়া হলোনা, ইতি টানতে হলো শিক্ষাজীবনের, সেই তরুনই একদিন হয়েছিলেন সাহিত্যসম্রাট, সাহসী রাজনীতিক আর দরদী সমাজসেবক। তিনি যে ভবিষ্যতে একজন সমাজদরদী ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবেন, তার লক্ষণ ফুটে উঠেছিল সেই কিশোর বয়সেই। তাঁর হৃদয় ছিল ফুলের মত কোমল। আর্ত-পীড়িতের জন্য তাঁর ছিল অপরিসীম করুণা। ছোটবেলা থেকেই মন তাঁর কেঁদে উঠতো মানুষের জন্যে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সেবাপরায়ন। যে সব রোগীর কাছে যেতে আত্মীয়রাও ভয় পেয়ে যেতো, শরৎচন্দ্র সেসব রোগীর পাশে গিয়ে বসতেন। রাত জেগে তাদের সেবা করতেন। মৃতদেহ সৎকারের কাজে এগিয়ে যেতেন।

কর্মজীবনে শরৎচন্দ্রের এসব মহৎগুণ আরো বিকশিত হয়েছিল। আগেই বলেছি তিনি ছিলেন একজন গায়ক। তিনি যদি শুধু সঙ্গীত নিয়ে পড়ে থাকতেন, তাহলে হতে পারতেন দেশের একজন বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী। বার্মার রেঙ্গুনে চাকুরী জীবনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি গান গাইতেন।

একবার কবি নবীনচন্দ্র সেন রেঙ্গুন গেলে তাঁর সম্মানে সেখানকার বাঙ্গালীরা বিপুল সম্বর্ধনার আয়োজন করেন। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে উপযুক্ত কণ্ঠশিল্পীর দরকার।

আয়োজনকারীরা একমত হলেন, বিশিষ্ট কবির সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার একমাত্র উপযুক্ত গায়ক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্র কিন্তু মোটেই আগ্রহ প্রকাশ করলেননা। অনেক অনুনয় বিনয় করে তাঁকে আনা হলো অনুষ্ঠানে। তিনি শর্ত দিলেন, মঞ্চে সবার সামনে গাইবেন না। তাঁর কথামত তিনি গান গাইলেন একটা পর্দার আড়ালে আসনে বসে। তিনি গাইলেন সুললিত কণ্ঠেঃ

"এস কবিবর এস হে!
ধন্য কর ব্রহ্মদেশ হে
সমবেত যত স্বদেশী,
তব দর্শন-অভিলাষী
লয়ে পূণ্য প্রতিভারাশি
একক কাব্য-আকাশ শশি হে।

সারাটা সভা মুগ্ধ হয়ে শুনলো শরৎচন্দ্রের কণ্ঠে এই সম্বর্ধনা সঙ্গীত। অভিভূত হলেন কবি নবীন চন্দ্র সেন নিজেও। কবি স্বচক্ষে দেখতে চাইলেন সুললিত কণ্ঠের অধিকারী এই গায়ককে। গুঞ্জরণ উঠলো শ্রোতাদের মধ্যেও। শরৎচন্দ্র ছিলেন লাজুক ও প্রচারবিমুখ। তিনি সবার চোখে ধূলো দিয়ে মঞ্চ থেকে সরে গেলেন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এদিকে নবীনচন্দ্র তাঁকে খুঁজলেন। গানের জন্যে ধন্যবাদ জানাতে চাইলেন। শরৎচন্দ্রকে না পেয়ে কবির মনে ভারী দুঃখ হলো। পরে অবশ্য শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। কবি নবীনচন্দ্র সেন শরৎচন্দ্রকে "রেঙ্গুন রত্ন" উপাধি দিয়েছিলেন।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ছিলেন একজন দরদী সমাজসেবক। রেঙ্গুনে চাকুরী জীবনে তিনি থাকতেন শহরের উপকণ্ঠে বোটাটং পোজনডং এলাকায় বাসা ভাড়া করে। এই এলাকাটিকে বলা হতো মিস্ত্রি পাড়া। এই পাড়াটিকে

ভদ্রলোকরা নিম্নশ্রেণীর লোকদের এলাকা বলেই জানতেন। কুলি, কামার ও মিস্ত্রিরা এখানে বসবাস করতো। ভদ্রলোকদের চোখে এসব মানুষ ছোট জাতের হলেও, শরৎচন্দ্রের চোখে তারা ছোট ছিলনা। তাঁর চোখে এদের একটাই পরিচয় ছিল, এরা মানুষ। তাই শরৎচন্দ্র এসব কুলি মজুর কামার মিস্ত্রিদের সঙ্গে অবাধে মেলা মেশা করতেন। বিপদে আপদে তাদের পাশে দাঁড়াতেন। ওরা কেউবা শরৎচন্দ্রকে 'বাবা ঠাকুর', কেউবা 'দাদা ঠাকুর' বলে ডাকতো।

শরৎচন্দ্র এসব নিরক্ষর অবহেলিত লোকদের চাকরির দরখাস্ত কিংবা চিঠিপত্র লিখে দিতেন। তাদের সামাজিক কিংবা পারিবারিক বিবাদ মিটিয়ে দিতেন। এসব লোক তাঁর কাছে ছুটে আসতো বিভিন্ন ব্যাপারে পরামর্শ নেয়ার জন্যে।

বলা যায় সরকার বা আদালতের চাইতে দাদা ঠাকুরের বিচারের ওপর তাদের ভরসা ছিল বেশী। দাদা ঠাকুর তাদের আপন জনের মতই ভালবাসতেন।

শরৎচন্দ্র হোমিও প্যাথিক চিকিৎসা করতেন। হাতলওয়ালা একটা কাঠের বাক্সে রকমারী ওষুধপত্র নিয়ে অবসর সময়ে মিস্ত্রি পাড়াতে বেরিয়ে পড়তেন। বাড়ি বাড়ি ঘুরে এসব অবহেলিত লোকদের খোঁজ খবর নিতেন। রোগীদের চিকিৎসা করতেন। সেবা করতেন। নিজের পকেটের পয়সা দিয়ে পথ্য কিনেদিতেন।

শরৎচন্দ্র ছোট্ট একটি কাঠের ঘরে দোতলায় থাকতেন। নীচের তলায় থাকতো একজন মিস্ত্রি। তার ছিল 'শান্তি' নামের একটি যুবতী মেয়ে। মেয়েটির মা মারা গেছে। মিস্ত্রি গভীর রাতে নেশা করে ঘরে ফিরতো। নেশার ঘোরে চেঁচামেচি করতো, বয়স্কা মেয়েটির গায়ে হাত তুলতো। মেয়েটি বাপের অত্যাচারে নীরবে কাঁদতো। ব্যাপারটি শরৎচন্দ্রের চোখ এড়ালোনা। তিনি মেয়েটির বাপকে এ ধরণের আচরণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করলেন। কিন্তু ঘটনা এখানেই শেষ হলোনা। মিস্ত্রি কিছুটা ভাল হয়ে চললেও, মদ খাওয়া বাদ দিলোনা। সে যা আয় করতো, খরচ করতো তার চেয়ে বেশী। ফলে অনেক টাকা তার দেনা হলো। সে কিছু টাকার বিনিময়ে নিজের মেয়েটিকে বুড়ো বয়সের একজন মাতাল মিস্ত্রির সঙ্গে বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করলো।

বাবার এই দুরভিসন্ধি টের পেয়ে 'শান্তি' নামের অসহায় মেয়েটি ছুটে গেলো শরৎচন্দ্রের কাছে। তাঁর পায়ে পড়ে আকুল আবেদন জানালোঃ দাদা ঠাকুর, আমাকে বাঁচান, আমার বাবা কিছু টাকার বিনিময়ে আমাকে এক মাতাল

দুশ্চরিত্র বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিতে চান।

শরৎচন্দ্র অসহায় মেয়েটির আকুল কান্নায় সাড়া দিলেন। তিনি পরদিন সকালবেলা গেলেন মিস্ত্রির বাসায়। মিস্ত্রিকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে অনুরোধ জানালেনঃ মেয়েটিকে যেন মাতাল বুড়োটার সঙ্গে বিয়ে দেয়া না হয়। অল্প কয়টি টাকার বিনিময়ে মেয়েটির এমন সর্বনাশ করা ঠিক নয়।

বুড়ো কিন্তু শরৎচন্দ্রের কথা কানে তুললো না। সে যুক্তি দিলো, টাকাগুলো হাতছাড়া করা যায় না। তার এখন টাকার ভারী প্রয়োজন। মেয়েটিকে ভাল জায়গায় পাত্রস্থ করার মত টাকাও তার নেই। সুতরাং যে সুযোগ পাওয়া গেছে, তাই ভাল।

শরৎচন্দ্র দেখলেন, বুড়ো মিস্ত্রি তার কথা কানে তুলছেনা। তিনি মহা ভাবনায় পড়ে গেলেন। এদিকে মেয়েটা অবুঝের মত কান্না জুড়ে দিলোঃ দাদাঠাকুর, আমাকে বাঁচান। আমি এই নরকযন্ত্রণা সহ্য করতে পারবোনা। আপনি অনাথের নাথ -- আপনি দেবতা। যাদের কেউ নেই, আপনি তাদের ভগবান -- আমাকে মানুষের মত বাঁচতে দিন দাদাঠাকুর---

শরৎচন্দ্রের হৃদয় কেঁদে উঠলো। তিনি শান্তিদেবীকে আশ্বাস দিয়ে বললেনঃ কাঁদিস্‌নে শান্তি, আর কাঁদিসনে। ওরে অভাগী, সারাটা জীবনতো কেঁদেই কাটালি। এবারে আয়, মানুষের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকবি।

শুধু মুখের সান্ত্বনা নয়। শরৎচন্দ্র বিয়ে করলেন শান্তি দেবীকে। দিলেন মানুষের অধিকার। বাঁধলেন সুখের নীড়।

শয়তানের পরাজয়

তোমরা কি কেউ শয়তান দেখেছো? নিশ্চয়ই দেখোনি। শয়তান মানুষের মধ্যে মিশে থাকে। মানুষের ক্ষতি করার চেষ্টা করে। শয়তান মানুষের ভালবাসা কিংবা সমাজে সুখ শান্তি একদম সহ্য করতে পারেনা। ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি মারামারি দেখলে খুশী হয়। শয়তান মানুষের সমাজে ঘুরে বেড়ায়। ঝগড়া-ঝাঁটি মারামারি বাধানোর চেষ্টা চালায়। একবার সফল হলে আনন্দে নেচে ওঠে। আপনজনদের নিয়ে একেবারে ভোজসভা বসায়। মানুষের দুঃখ-দুর্দশাই তার আনন্দ, তার পুরষ্কার। এবারে তোমাদের একটি শয়তানের গল্প শোনাবো। গল্পটি লিখেছেন লিও টলষ্টয়। রাশিয়ায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মহান লেখকের গল্পটি শোনা যাক।

এক দেশে এক ধনী লোক ছিলেন। তার ছিল অগাধ ধন-দৌলত। তার সম্পত্তি আর ভেড়ার পাল দেখার জন্যে ক্রীতদাসও ছিল অনেক। লোকটি ক্রীতদাসদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতেন। ক্রীতদাসরাও তাকে ভালবাসতো। মণিবের তারিফ করে বলতোঃ আমাদের মনিবের চাইতে ভাল মনিব দুনিয়ায়নেই।

সত্যি সত্যি তার মত ভাল মনিব আর হয়না। তিনি যার যতটুকু সাধ্য তাকে ততটুকু কাজ দিতেন। কারোর ওপর বেশী কাজের চাপ পড়লো কিনা লক্ষ্য করতেন। তিনি দাস বলেই তাদের পশুর মত খাটাতেন না। মানুষের মর্যাদা দিতেন। তাদের খোঁজখবর নিতেন।

এমন মনিব পেয়ে দাসরা শান্তিতে দিন কাটাতে লাগলো। সে এলাকায় ঘোরাফেরা করতো এক শয়তান। মনিবের সঙ্গে

দাসদের মধুর সম্পর্ক দেখে তার গা জ্বলে উঠলো। সে চাইলো একটা ঝগড়া বাধাতে।

শয়তান একদিন একজন ক্রীতদাসকে আদর করে কাছে ডাকলো। এই দাসের নাম এলেব। শয়তান ভাল মানুষ সেজে এলেবের সঙ্গে নানা আলাপ শুরু করে দিলো। এক সময় বললোঃ ভায়া, শুনেছি তোমাদের মনিব নাকি ভাল মানুষ। কিন্তু একটা কথা কি জানো, মনিবরা কাজ আদায় করার জন্যে অমন ভাল ব্যবহার একটু করেই থাকে।

শয়তানের কথাটা এলেবের মনে খাটলো। সে অন্য ক্রীতদাসদের মধ্যে বলে বেড়াতে লাগলোঃ মনিবের গুণ গান করা নেহায়েত বোকামী। আমরা ভালভাবে কাজ করি বলেই তিনি ভাল ব্যবহার করেন। ওটা তার দয়া না ছাই। কেউ কেউ এলেবের সঙ্গে বাজি ধরলো। তারা এলেবের কথা স্বীকার করতে রাজী হলোনা। তারা বললোঃ আমাদের মনিব সম্পর্কে আর এমন কথা মুখে এনোনা।

এলেব বললোঃ দেখবে, মনিবের একটু ক্ষতি হয়ে গেলে তিনি আর ভাল ব্যবহার করবেন না। নিজের কাজ আদায়ের জন্যেই তিনি ভাল ব্যবহার করছেন।

এলেবের সঙ্গে দাসদের তর্ক হলো। শেষে এলেব বললোঃ দেখবে, আমি মনিবকে ক্ষেপিয়ে তুলবো। তখন তিনি নিশ্চয়ই খারাপ ব্যপহার করবেন।

এবারে দাসরা ঠিক করলো, সত্যি এলেব যদি মনিবকে ক্ষেপাতে পারে, তাকে সবাই তাদের ছুটির সব জামা দিয়ে দেবে। আর এলেব যদি ক্ষেপাতে না পারে, সে ছুটির জামা নেবেনা।

এলেব ছিল ভেড়ার রাখাল। সে মনিবের কিছুসংখ্যক প্রিয় ও দামী ভেড়া দেখা শোনা করতো। পরদিন মনিব এলেন

কয়েকজন অতিথি নিয়ে। অতিথিরা ভেড়া দেখবেন। মনিব ঘুরে ঘুরে অতিথিদের ভেড়া দেখাতে লাগলেন। তখনও মূল্যবান একটি ভেড়া দেখানো হয়নি।

এলেব কাছেই দাঁড়িয়েছিল। অন্য দাসরা তার কান্ড দেখার জন্য অপেক্ষা করছিল। মনিব যখনই মূল্যবান ভেড়াটি দেখানোর জন্য স্থির হয়ে দাঁড়ালেন, অমনি এলেব কি একটা অজুহাত দেখিয়ে হাত নাড়া দিলো। সব ভেড়া ভয়ে পালিয়ে গেলো। সেই মূল্যবান ভেড়াটিকেও আর দেখা গেলনা। মনিব বার বার চেষ্টা করলেন অতিথিদের ভেড়াটি দেখাতে। এলেব এমন ভঙ্গী করলো যে ভেড়াটি কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়ালো না।

এবারে মনিব আদর করে এলেবকে বললোঃ বন্ধু আমার, বাঁকা শিংওয়ালা ভেড়াটাকে ধর। কিছুক্ষণ ধরে রাখো আমাদের সামনে।

এলেব সিংহের মত এক লাফ দিয়ে ধরে ফেললো দামী ভেড়াটাকে। পেছনের বাঁ পা ধরে এমন জোরে ঝাঁকুনি দিলো যে, ভেড়াটার পা-ই ভেঙ্গে গেলো। এলেব এবারে ধরলো ডান পা।

অতিথিরা চিৎকার দিয়ে উঠলো। কেউবা বললোঃ আহা, বেচারা ভেড়াটা মরে যাবে যে। অন্য দাসরাও দুঃখ পেলো। মনিবতো আঘাত পেলেনই। কিন্তু বাইরে প্রকাশ করলেন না।

এদিকে শয়তান কিন্তু কাছেই ছিল। একটা গাছে বসে সব কিছুই দেখছিল সে। এলেবের কান্ড দেখে ভারী আনন্দ পেলো। মনে মনে আশা করলো, বড় ধরণের একটা সর্বনাশ ঘটুক। মনিব রেগে গিয়ে একটা অঘটন ঘটিয়ে বসুক।

মনিব কিন্তু কিছুই বললেন না। নীরবে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। সামলে নিলেন নিজেকে। তারপর এলেবকে হেসে বললেনঃ এলেব, আমি তোমার ওপর রাগ করিনি। তুমি ভাবছো তোমাকে আমি শাস্তি দেবো। না, তা আমি দেবোনা। তুমি মুক্তি চাও? অতিথিদের সামনে তোমাকে আমি মুক্তি দিচ্ছি। যেখানে খুশী তুমি যেতে পারো। এসো, তোমার ছুটির পোষাকটা তুমি নিয়ে যাও।

মনিব অতিথিদের নিয়ে চলে গেলেন। এলেব মনিবের ব্যবহারে মুগ্ধ হলো। শত চেষ্টা করেও মনিবের বিরুদ্ধে যেতে পারলোনা। অন্য দাসরাও মনিবের আরো ভক্ত হলো। মনিবের প্রতি দাসদের ভালবাসা আরো বেড়ে গেলো। এসব দেখে শয়তানের বুকটা ব্যথায় জ্বলে উঠলো। সে গাছ থেকে পড়ে মাটির নীচে তলিয়ে গেলো।

মানুষে মানুষে ভালবাসা থাকলে শয়তান কিছুই করতে পারেনা।

যে কবি দুরন্ত পথিক

একটি ছোট্ট ছেলে। ভারী ডানপিটে সে। পাড়ার ছেলেদের নিয়ে বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। দল বেঁধে ফল পেরে খায় -- তার জ্বালায় সবাই অস্থির। ছেলেটা ডানপিটে হলে কি হবে, গুণীও বটে। তার মত ছেলে সারা তল্লাটে খুঁজে পাওয়া ভার।

ছেলেটার বয়স কতইবা হবে। বেশী হলে দশ বছর। ঐ বয়সেই ছেলেটি প্রাইমারী স্কুলের পড়া শেষ করে। আবার ঐ বয়সেই পাঠশালায় শিক্ষকতা করে। বাড়ির মসজিদে ইমামতি করে। ভেবে দেখোতো, কত গুণী এই ছেলেটা!

এগারো বছর বয়সে ছেলেটা চাচার কাছে ফার্‌সী ভাষা শেখে। আবার চাচার সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে পদ্য লেখে, গান লেখে। তার ছোট বেলার একটি পদ্য শোনো তা হলেঃ

রবোনা কৈলাসপুরে
আই এ্যাম ক্যালকাটা গোয়িং--
যতসব ইংলিশ ফ্যাসন
আহা মরি কি লাইট্‌নিং
ইংলিশ ফ্যাসন সবি তার,
মরি কি সুন্দর বাহার--
দেখলে বন্ধু দেয় চেয়ার,
কাম অন ডিয়ার গুড মর্নিং

দেখোতো, কি সুন্দর এই পদ্যটি। বড় হয়ে এই কবি অনেক কবিতা লিখেছেন, গান লিখেছেন-- লিখেছেন গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ। তিনি আর কেউ নন-- তিনি তোমাদেরই প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

ছোটবেলা থেকে কেমন কঠোর সাধনা করে তিনি মানুষ হয়েছিলেন, একজন সেরা কবি হয়েছিলেন, ভাবলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে। ছোটবেলা বাবাকে হারিয়েছেন, কিন্তু অন্ধকারে হারিয়ে যাননি এই কবি। ছোটবয়সেই দুঃখিনী মাকে নিয়ে, সংসার নিয়ে ভাবতে হয়েছে। রোজগার করতে হয়েছে। পাঠশালায় পড়িয়ে, মস্‌জিদে ইমামতী করে যা পেতেন, তাতে সংসারের খরচ মিটতোনা। তিনি লেটো দলে গান গেয়েছেন, কবি হিসেবে সুনাম হয়েছে কিন্তু সংসারের সবটুকু খরচ কি মিটলো তাতে? মিটলোনা বলেই ছাড়লেন লেটো দল। আসানসোলে রুটির দোকানে কাজ নিলেন। এভাবেই সামান্য রোজগারের আশায় এক ডাল থেকে আরেক ডালে ছুটতে হলো তাঁকে।

যে বয়সে তোমরা লেখাপড়া শিখে পরীক্ষায় পাশ দিচ্ছো, সে বয়সে কবি ময়দা মাখছেন রুটির দোকানে। সামান্য চাকরী করেছেন গার্ড সাহেবের অধীনে। কোথাও স্থীরতা নেই, আজ এখানেতো কাল ওখানে। এমন কঠিন অবস্থার মধ্যেও তিনি মানুষ হওয়ার কথা ভোলেন নি। অনেক বই পড়েছেন, পুঁথি পড়েছেন। আবার হাই স্কুলে পড়ার সামান্য সুযোগটুকুও কাজে লাগিয়েছেন। কাজী রফিজুল্লাহর সঙ্গে ময়মনসিংহের কাজীর শিমলায় চলে এসেছেন। পড়াশোনা করেছেন দরিরামপুর হাই স্কুলে। কিন্তু সেখানেও স্থীর থাকতে পারেননি। আবার ছুটে গেছেন রানীগঞ্জে। ভর্তি হয়েছেন শিয়ারশোল রাজাদের স্কুলে। সেখানেই কি তিনি স্থীর থাকতে পেরেছিলেন। না, তিনি স্থীর থাকতে পারেননি। প্রবেশিকা পরীক্ষাও তাঁর দেয়া হলো না। ক্লাশ টেনে পড়তে পড়তেই তাঁর শিক্ষা জীবন শেষ হলো।

কেন কবির এই অস্থিরতা? তা হলে কবির জীবনের বাস্তব

দু'একটি ঘটনা তোমাদের শোনাতে চাই।

তখন বৃটিশ আমল। স্বাধীনতার জন্যে ভারত জুড়ে সংগ্রাম চলছে, লড়াই চলছে। দেশের মানুষ বৃটিশের শাসন চায়না। নজরুলের মনেও বৃটিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমতে লাগলো।

পড়া শোনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি ভাবতে থাকলেন বৃটিশ তাড়ানোর কথা।

তখন শিয়ারশোল হাই স্কুলে পড়েন তিনি। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তার সহপাঠী। পরবর্তীকালে শৈলজানন্দ হয়েছিলেন একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক। দুই বন্ধু পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্যের আলোচনা করেন, নানা গল্প করে বেড়ান। নজরুল, শৈলজানন্দ ও আরেকজন বন্ধু পঞ্চানন ঘোষ ঘুরে বেড়ান বনে বনে। পঞ্চানন ঘোষের ছিল একটি এয়ার গান। পাখি শিকারের জন্যেই এয়ারগান নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন তাঁরা। কিন্তু নজরুল পাখি রেখে ভাবতেন অন্য কথা। তিনি বলতেন, পাখি নয়, এবারে ইংরেজ মারতে হবে। তিনি এয়ার গানটা হাতে নিয়ে ইটের বেদির ওপর গুলি ছুঁড়তেন আর বলতেন, এই বড় লাট খতম হলো, এই ছোট লাট খতম হলো--

এভাবে ছোটলাট, বড়লাট এবং ইংরেজদের বড় বড় দালালদের গুলি করতে করতে উল্লাসিত হয়ে উঠতেন নজরুল। সত্যিকারের ইংরেজ তাড়ানোর আনন্দ পেতেন তিনি। শৈলজানন্দ আর পঞ্চানন চেয়ে চেয়ে দেখেতেন নজরুলের কান্ড কীর্তি।

এক দিনের কথা। বন্ধু শৈলজানন্দ ও পঞ্চাননকে নিয়ে খ্রীষ্টান গোরস্থানে আড্ডা দিচ্ছিলেন নজরুল। নিত্য দিনের মত নজরুল তাঁর বন্ধু পঞ্চুর বন্দুক দিয়ে ইংরেজকে গুলি করছিলেন। প্রবল উত্তেজনায় বলছিলেন, এদেশ থেকে ইংরেজ তাড়াতে হবে।

সে পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন নিবারনচন্দ্র ঘটক। তিনি একজন বিপ্লবী। বৃটিশ তাড়ানোর জন্যে লড়াই করছেন। নজরুলের স্কুলের শিক্ষক। তিনি নজরুলের কথা শুনে থমকে দাঁড়ালেন। বললেনঃ ইংরেজ তাড়াবে কে--রে?

শৈলজানন্দ আর পঞ্চানন দেখিয়ে দিলেন নজরুলকে।

নিবারণ চন্দ্র তাকালেন নজরুলের দিকে। দেখলেন, এই ছেলে অন্য দশজনের মত নয়। তার চোখে আছে স্বপ্ন আর আগুন। তিনি বললেনঃ বেশতো, ইংরেজ তাড়াতে চাও তুমি, কিন্তু কেমন করে তাড়াবে?

ঃ তা এখনও জানিনা। বললেন নজরুল।

ঃ বেশ, তা হলে আমার সঙ্গে চলো। তোমাকে আমি সব শিখিয়ে দেবো। এই বলে নিবারণচন্দ্র নজরুলকে সঙ্গে নিয়ে

চলে গেলেন।

নিবারণচন্দ্র নজরুলের হাতে তুলে দিলেন একটি ব্যাগভর্তি বারোটি পিস্তল আর রিভালভার। বললেনঃ বীরভূমের নলহাটি থানায় আমার বোন দু'কড়ি বালা চক্রবর্তীর হাতে পৌঁছে দিতে হবে এটা। নজরুল বিন্দুমাত্র ভয় পেলেন না। বুক ফুলিয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন তিনি। আলোয় উজ্জ্বল ভবিষ্যত ডাকলো তাঁকে হাতছানি দিয়ে। নিবারণচন্দ্র ঘটকের বিপ্লবের দীক্ষা নিলেন তিনি।

বিপ্লব করবেন কি দিয়ে। ইংরেজ তাড়াবেন, হাতিয়ার কই? ইংরেজ তাড়াতে যুদ্ধ জানতে হয়। চাই অস্ত্রশস্ত্র। একদিন সে সুযোগও জুটে গেলো।

১৯১৪ সালে শুরু হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এত দিন বৃটিশ ইচ্ছে করেই বাঙ্গালীদের সৈন্য বাহিনীতে নেয়নি। এখন তাদের সৈন্য বাড়ানোর দরকার। তাই তারা বাঙালীদের ভারতীয় বৃটিশ বাহিনীতে নিতে শুরু করলো।

তখন ১৯১৭ সাল। নজরুল পড়েন ক্লাশ টেনে। তাঁর প্রাণ জুড়ে যুদ্ধের দুন্দুভি বেজে উঠলো। তিনি পড়া ছেড়ে ছুটে এলেন রাস্তায়। বন্ধু শৈলজানন্দকে নিয়ে একদিন দাঁড়ালেন গিয়ে বর্ধমান রেলষ্টেশনের প্লাটফর্মে। ট্রেনের কামরায় দেখতে পেলেন একদল বাঙ্গালী সৈনিক। পরনে খাঁকি প্যান্ট। বাঙ্গালী সৈন্য দেখে শ্লোগানে মুখর হয়ে উঠলো সারাটা ষ্টেশন।

নজরুল অনুপ্রাণিত হলেন, উৎসাহিত হলেন। শৈলজানন্দকে বোঝালেন, এবারে যুদ্ধবিদ্যাটা শিখবো। ভারত বর্ষে গড়ে তুলবো মুক্তিবাহিনী। তাড়াবো বেনিয়া ইংরেজদের।

সত্যি, কবি নজরুল নাম লোখালেন বাঙালী পল্টনে। চলে গেলেন সুদূর করাচী। মুক্তিপাগল এই কবি চল্-চল্-চল্- এগিয়ে চল্লেন সামনের দিকে।

দেশপ্রেম আর অদম্য সাহস মানুষকে যে কত বড় করতে পারে, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

কল্পনায় বড়

তোমরা অনেকেই মনে মনে ভেবে থাকো, বড় একজন ধনী হবে কিংবা সমাজের নামকরা কিছু একটা হবে। কিন্তু ভাবলেইতো হবে না, কাজও করতে হবে। সমাজে এমন অনেক লোক আছে যারা কেবল ভাবে। ভাবতে ভাবতে অনেক ওপরে উঠে যায় আর হঠাৎ ধপ্ করে পড়ে য়ায় নীচে। আজ এমন একজনেরই গল্প করবো।

এক যে ছিল ধনী লোক। তার বাড়িতে ছিল একজন চাকর। প্রত্যেকবারই খাওয়ার সময় চাকরটিকে কিছু ঘি দেওয়া হতো। চাকরটি ঘিটুকু না খেয়ে একটি পাত্রে জমিয়ে রাখতো। একদিন সে দেখলো বেশ কয়েক সের ঘি জমেছে। মন তার আনন্দে নেচে উঠলো।

চাকরটি ছিল ভেড়ার রাখাল। একদিন সে ঘিয়ের পাত্রের পাশে বসে অলস সময় কাটাচ্ছিল। ভাবছিল সে ঘিয়ের কথা। তার হাতে ছিল ভেড়া তাড়ানো লাঠি। সে ঘিয়ের পাত্রের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল, আনেক ঘি জমেছে। ঘি বেচে অনেক পয়সা পাওয়া যাবে। সেই পয়সা দিয়ে সে একটা ভেড়া কিনবে। ভেড়ার বাচ্চা হবে। বাচ্চা গুলোরও বাচ্চা হবে। ভেড়ার পালে বাড়ি ভরে যাবে।

লোকটার চোখে স্বপ্ন নামলো। সে ভেবেই চললো। এত ভেড়া দিয়ে সে কি করবে? বাজারে বিক্রি করবে। তার অনেক অনেক টাকা হবে। সে বাড়ি তৈরি করবে। বিয়ে করবে। তার সুন্দর একটি সংসার হবে। তার ছেলে হবে। ছেলেকে সে স্কুলে পড়তে পাঠাবে। ছেলে লেখাপড়া শিখে অনেক বড় হবে। তাকে খুশী করবে। কিন্তু ছেলে যদি স্কুলে না যায়? লেখাপড়া না শেখে? কেবল দুষ্টামী বাঁদরামী করে?

হ্যা, ছেলে যদি তার কথামত না চলে, তা হলে সে ছেলেকে আচ্ছা শায়েস্তা করবে।

কি ভাবে শায়েস্তা করবে ভাবতে গিয়ে হাতের লাঠি দিয়ে জোরে ঘা মারলো সে। লাঠির আঘাত লাগলো ঘিয়ের পাত্রে। অমনি ওটা ভেঙ্গে সমস্ত ঘি পড়ে গেলো।

কেবল যারা কল্পনায় বড় হতে চায়, তাদের পরিনতি এমনটিই হয়ে থাকে।

ভাষার জন্যে ভালবাসা

একদিন দুপুর বেলা নিখোঁজ হয়ে গেলো সেই ছেলেটি। লোকজন তাকে খুঁজতে বেরুলো। এখানে খুঁজলো, সেখানে খুঁজলো, কিন্তু পাওয়া গেল না। কেবল তার জামা কাপড় পাওয়া গেলো পুকুরের ঘাটে। মাতো কেঁদেকেটেই অস্থির। ছেলেটা কি তা হলে পুকুরে ডুবলো? আসলে কিন্তু তাও নয়। তাহলে কি হলো?

শোনো তাহলে ছেলেটার কাণ্ড।

পুকুরের ঘাটে সে গিয়েছিল হাত মুখ ধুতে। এমন সময়ে বাঁশির মিষ্টি মধুর সুর ভেসে এলো তার কানে। পাগল হয়ে উঠলো তার মন। এমন মিঠে সুরে কে বাজায় ওই বাঁশি! দেখতেই হবে বাশিঁর রাজা সেই মানুষটিকে। অমনি ছুটলো সেই ছেলেটি। গিয়ে দেখলো এক রাখাল ছেলে মিঠে সুরে বাঁশি বাজাচ্ছে। এক পাল গরু চড়ে বেড়াচ্ছে তার আশে পাশে। ছেলেটিরও ইচ্ছে হলো রাখাল হতে। ঘুরে ঘুরে মেঠোসুরে বাঁশি বাজাতে।

রাখাল ছেলের সঙ্গে গাছের ঠান্ডা ছায়ায় বসে কতনা গল্প করলো সে। রাখালও তাকে কাছে পেয়ে খুশী হলো। ভদ্রঘরের ছেলে; পাঠশালায় লেখাপড়া করে, সে কিনা এসেছে একজন রাখালের কাছে। রাখালের বেশ ভাল লাগলো ছেলেটিকে পেয়ে। গল্পে গল্পে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো। সন্ধ্যা নামলো। রাখাল ছেলের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে গরু চড়ালো ছেলেটি। কিছুতেই তার ঘোর কাটেনা। যেন স্বপনপুরীর এক রাজপুত্রের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। চারদিকে সবুজ ফসলী মাঠ, মাথার ওপর খোলা আকাশ, স্বপনপুরী নয়তো কি!

এক সময় ঘোর কাটলো। ভয় পেয়ে গেলো ছেলেটি। মনে

পড়ে গেলো, সেতো পুকুরের ঘাটে এসেছিল হাতমুখ ধুতে। সন্ধ্যায় পা টিপে টিপে ঢুকলো বাড়িতে। মায়ের চিন্তা দূর হলো। বুকের ধন বুকে ফিরে এলো। ছেলেকে সাবধান করে দিলেন মা।

আসলে যারা মহান, যাদের হৃদয় খুব বড়, তারাই সুরের পাগল, তারাই ছুটে যান খোলা আকাশের নীচে, মিশে যান মানুষ ও প্রকৃতির মাঝে। সুরের পাগল এই মানুষটিও একদিন হয়েছিলেন একজন স্মরণীয় মহাপুরুষ। নাম তাঁর ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

এই নামটির সঙ্গে অনেক আগেই তোমাদের পরিচয় ঘটেছে, আশা করি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম, এ, এবং আইন পাশ করেছেন তিনি। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। ওকালতিও করেছেন চার বছর। এসব কাজ তাঁর জন্যে মামুলি ঘটনা মাত্র। তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় কীর্তি, তিনি বহু ভাষাবিদ। তিনি শিখেছিলেন নানান ভাষা -- আসামী, ওড়িয়া ও মৈথিলি, হিন্দি, পাঞ্জাবী ও গুজরাটি, মারাঠি, সিন্ধি ও লাহিন্দা, কাশ্মীরি, নেপালী ও সিংহলি, মালদ্বীপি, প্রাকৃত ও তিব্বতি। তাছাড়া বিশ্বের নাম করা ভাষাগুলোতো আছেই। যেমন ইংরেজী, আরবী, ফারসী, উর্দু প্রভৃতি।

ডক্টর শহীদুল্লাহর জ্ঞানের পিপাসা ছিল তৃষ্ণার্ত মরুভূমির মত। তাঁর ইচ্ছে করতো জ্ঞানের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে সবটুকু গ্রাস করতে। তাই সে যুগের খাঁটি মুসলমান হয়েও তিনি সংস্কৃতে এম. এ. পড়তে চাইলেন। জানতে চাইলেন বেদ-বেদান্তের নানা তত্ত্বকথা। প্রবল আগ্রহ নিয়ে ভর্তি হলেন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সংস্কৃতে এম. এ. পড়তে হলে বেদ পড়তে হবে। কিন্তু পড়াবে কে? বেদ-এর অধ্যাপক ছিলেন

একজন গোঁড়া হিন্দু। তিনি বাধা দিলেন; বললেনঃ হিন্দু ছাড়া আর কাউকে বেদ পড়ানোর নিয়ম নেই। শহীদুল্লাহকে বেদ পড়ানো যাবেনা।

শহীদুল্লাহ পড়ে গেলেন মহা মুস্কিলে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েও পড়া বন্ধ করতে হবে! তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জানালেন কথাটা। তখনকার বাংলার মুকুটহীন রাজা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মাওলানা মোহাম্মদ আলী তাদের কাগজে কড়া ভাষায় গোঁড়া হিন্দু অধ্যাপকের সমালোচনা করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলোনা। তিনি গেলেন বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে।

আশুতোষ তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর। ব্যাপারটা শুনে তিনি ভাবলেন অনেক কিছু। ছাত্র শিক্ষকে বিবাদ হোক -- তা তিনি চাইলেন না। তিনি শহীদুল্লাহকে অন্য বিষয় নিয়ে পড়বার পরামর্শ দিলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন একটা নতুন বিষয় চালু হয়েছে। বিষয়টির নাম তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব। শহীদুল্লাহ সেই বিষয়ে এম. এ. পাশ করলেন।

১৯১৯ সালের কথা। শহীদুল্লাহ তখন ওকালতি করছেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো একদিন। আশুতোষ তাঁকে বললেনঃ তোমার জন্যে ওকালতি নয় শহীদ, চলো-- তোমাকে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী দেবো।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরী হয়ে গেলো শহীদুল্লাহর। বড় চাকরী। গবেষনার কাজ। তখনকার দিনের দু'শ' টাকা মাইনে। আর কি, খেয়ে পরে ভালোই কাটবে তাঁর। তিনি কিন্তু সাধারণ মানুষের মত খেয়ে পরে সুখী হওয়ার কথা ভাবলেন না। মাইনের টাকা দিয়ে বের করলেন তোমাদের

মত ছোটদের জন্যে একটি পত্রিকা। ছবিওয়ালা এই মসিক পত্রিকাটির নাম -- 'আঙুর'।

'আঙুর' পত্রিকা পেয়ে শিশুরা যেমন খুশী হয়েছিল, তেমন খুশী হয়েছিলেন বড়োরাও। দীনেশচন্দ্র সেন খুশী হয়ে চিঠি লিখেছিলেন তাঁকে, 'আপনার মত এত বড় পন্ডিত-- যাহার বিদ্যার পরিধি আয়ত্ত করিবার সাধ্য আমাদের নাই, যিনি বেদ-বেদান্তের অধ্যাপক, ফারসী ও আরবী যাহার নখ দর্পনে, যিনি জার্মান ব্যাকরণের ব্যূহ ভেদ করিয়া অবসর রঞ্জন করেন -- তিনি একটি 'আঙুর' হাতে করিয়া উপস্থিত।'

এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলামও লিখেছিলেন।

এতবড় পন্ডিত -- এতগুলো ভাষা জেনেও তাঁর অহংকার ছিলনা। তিনি বলতেন, আমি ভাষা জানি কেবল একটাই, নাম তার বাংলাভাষা। নিজের মাতৃভাষা বাংলাভাষাকে তিনি মায়ের মত ভালবাসতেন।

পাকিস্তান হবার পর সরকার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা চালালেন। শহীদুল্লাহ সরকারের এই চেষ্টার বিরোধিতা করলেন। তিনি আগে থেকেই লিখে আসছিলেন, বাংলাকে দেশের রাষ্ট্রভাষা করা উচিত।

সরকার আরবী হরফে বাংলা লেখারও চেষ্টা চালালেন। এবারেও শহীদুল্লাহ রুখে দাঁড়ালেন।

পাকিস্তান সরকার বাংলাকে ভাল চোখে দেখতেন না। তাই তারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে চান নি। এমন কি বাংলা হরফও তারা মুছে দিতে চাইলেন। শহীদুল্লাহ প্রতিবাদ করলেন, লিখলেন সরকারী লোকদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। সরকারের বিরোধিতা করার দায়ে শহীদুল্লাহর দুই ছেলেকে বন্দী করা হলো। তবুও তিনি দমলেন না। মায়ের ভাষা বাংলা ভাষার জন্যে তিনি সংগ্রাম চালিয়ে গেলেন।

সেদিন ছিল ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে আইন ভেঙ্গে মিছিল বের করলো ছাত্ররা। পুলিশ গুলি চালালো। শহীদ হলো বরকত, রফিক, জব্বার।

শহীদুল্লাহ শুনতে পেলেন খবরটা। উত্তেজিত হয়ে উঠলেন তিনি। মায়ের ভাষা বাংলাভাষার জন্যে রক্ত দিয়েছে ছাত্ররা। তাঁর সন্তানেরা। তিনিতো চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। তিনি স্ত্রীকে আচকান দিতে বললেন। দাঁড়ি ছাঁটার ছোট কাঁচিটা হাতে নিলেন। আচকানের নিচের দিক থেকে কেটে নিলেন খানিকটা কালো কাপড়। বললেনঃ কালো ব্যাজ পরিয়ে দাও আমাকে।

বাংলা ভাষার প্রতি কি গভীর টান ছিল তাঁর!

মৃত্যু শয্যায় শুয়েও মা মাতৃভাষাকে ভোলেননি তিনি। হাসপাতালে অসুস্থ থাকা অবস্থায় একবার এলো একুশে

ফেব্রুয়ারী। শহীদুল্লাহ অস্পষ্ট স্বরে বল্‌লেনঃ আমার ব্যাজ দাও, ব্যাগ দাও -- আমি বাংলা একাডেমীতে বক্তৃতা দিতে যাবো।

সবাই বোঝালো, আপনার শরীর ভাল নয়, আপনি হাঁটতে পারেন না, কেমন করে যাবেন বক্তৃতা দিতে।

শহীদুল্লাহ হাসপাতালের চাকা লাগানো চেয়ার দেখিয়ে বললেন, আমি ঐ বাক্সে চড়ে যাবো।

আজীবন যিনি বাংলা ভাষার সেবা করে এসেছেন, তিনি কি আর চুপ থাকতে পারেন!

এতবড় একজন পন্ডিত, বহুভাষাবিদ, সাহিত্যিক-- তাঁর জীবনে এসেছিল একটি বেদনার মুহূর্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইনে নিতে হবে। শহীদুল্লাহ তখন এতই অসুস্থ, কাগজে সই দিতে পারছেন না। মাইনে নিতে হলে সই না হয় টিপসই দিতে হবে।

চুপে চুপে তার টিপসই নেয়া হচ্ছিল। টের পেলেন শহীদুল্লাহ। তিনি টিপসই দিলেন না। বললেনঃ টিপসই দিয়ে টাকা আমি নেবোনা।

তাঁকে দিয়ে টিপসই করানো সম্ভব হলো না। এটাইতো স্বাভাবিক। যিনি আজীবন অশিক্ষা আর নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে লড়েছেন, জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন, তিনি করবেন টিপসই! না, তা হয় না।

একদিন তোমরা বড় হবে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মত মাতৃভাষার সেবায় জীবন বিলিয়ে দেবে।

একটি মিথ্যে কথা

একদিন এক ধনী ব্যবসায়ী একজন চাকর চেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলেন। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বের হওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই দু'টি কিশোর এসে হাজির হলো ব্যবসায়ীর বাসায়। তারা তাদের পরিচয় দিলো।

ধনী লোকটি ধান, চাল, গম প্রভৃতি খাদ্যশস্যের ব্যবসা করতো। এসব খাদ্যশস্য রাখার জন্যে তার ছিল কয়েকটি বড় বড় গুদাম। এসব দেখা শোনার জন্যেই তার চাকরের প্রয়োজন। ব্যবসায়ী প্রথম একটি ছেলের কাছে তার পরিচয় জানতে চাইলো। ছেলেটি বললোঃ আমার নাম আদু। ছোটবেলা বাপ-মাকে হারাই। তারপর থেকে বিভিন্ন জায়গায় ছোট খাট কাজ করে বেঁচে আছি। ঘর গেরস্থালি আর ব্যবসার ছোট-খাট কাজে আমার অভিজ্ঞতা আছে। বর্তমানে আমি বেকার। আমার একটি গুণ আছে, কখনও মিথ্যে কথা বলিনা।

ধনী লোকটি বল্‌লোঃ বেশ গুণ তোমার। তুমি কত টাকা মাইনে চাও?

আদু বললোঃ আমি এক হাজার টাকা মাইনে চাই। আর খোরাকও দেবেন।

এবারে ধনী লোকটি পরিচয় চাইলো অন্য ছেলেটির। সেই ছেলেটি বললোঃ আমার নাম খাদু। দু'পয়সা রোজগারের জন্য আমি বাপ-মা ছেড়ে শহরে এসেছি। আমি ঘরের এবং ব্যবসায়ের কাজে খুবই পটু। আমার মত জিতে কেউ বাজার

করতে পারে না। তবে আমার একটি অভ্যেস, আমি বছরে একটি মিথ্যে কথা বলি।

এবারে ধনী লোকটি খাদুকে জিজ্ঞেস করলোঃ তুমি কত টাকা চাও?

খাদু জবাব দিলোঃ দু'শ টাকা আর খোরাক।

ধনী লোকটি কতক্ষণ চেয়ে রইলেন খাদুর মুখের দিকে। তিনি ভারী আনন্দিত হলেন। এত সস্তায় চাকর পাওয়া তার ভাগ্যে আর জোটেনি। তিনি ভাবতে লাগলেন, আদুকে যেখানে এক হাজার টাকা দিতে হবে, খাদুকে সেখানে দুশ' টাকা দিলেই চলবে। অকারণে কে যায় বেশী টাকা খরচ করতে। আর তাছাড়া, বছরে দু'একটা মিথ্যে কথার বিনিময়ে এত সস্তায় চাকর পাওয়াতো ভাগ্যের কথা। তাই ব্যবসায়ী খাদুকেই চাকর নিয়োগ করলেন।

ধনী ব্যবসায়ী তার কাজে ব্যস্ত থাকেন। এখানে ওখানে যাতায়াত করেন। গুদামের দেখাশোনা খাদুকেই করতে হয়। একদিন গুদামে আগুন লাগলো। আগুণ নেভাতে ছুটে এলো প্রতিবেশীরা। কিন্তু সুবিধে হলোনা। দমকল বাহিনীকে খবর দিতে হবে। টেলিফোন ছিল সেখান থেকে আধ মাইল দূরে মনিবের অন্য একটি গুদামে। সেখানেই কাজে গেছেন মনিব। খাদুকে পাঠানো হলো মনিবের কাছে জানাতে। খাদু সেখানে ছুটে গিয়ে ধনী ব্যবসায়ীকে জানালোঃ হুজুর আপনার গুদামে ডাকাত পড়েছে, এখ্খুনি পুলিশে খবর জানাতে হবে।

ব্যবসায়ী তখখুনি পুলিশকে ফোন করে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ হাজির হলো গুদাম-এলাকায়। তারা দেখতে পেলেন, দাউ দাউ করে আগুণ জ্বলছে সারাটা গুদাম-এলাকায়। প্রতিবেশীরা অতিকষ্টে কিছু কিছু মালপত্র আগুণের হাত থেকে সরিয়ে রাখছিল। পুলিশ ভাবলো, ডাকাতরা আগুণ লাগিয়ে দিয়ে মালপত্র সরিয়ে নিচ্ছে। তারা

প্রতি বেশীদের লক্ষ্য

করে গুলি ছুঁড়লো। কেউ কেউ গুরুতর আহত হলো। পুলিশ লোকজনকে গ্রেপ্তার করলো। দমকল বাহিনীকেও খবর দেয়া হলো। কিন্তু বড় দেরীতে। ততক্ষণে অনেক কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। অবশেষে আগুনও নেভানো হলো। জানা গেলো এটি একটি অগ্নিকান্ড--ডাকাতির ঘটনা নয়। মাঝথেকে কতগুলো লোক গুরুতর আহত হলো। তাদের পাঠানো হলো হাসপাতালে। যে সব মালপত্র উদ্ধার করা যেতো, তাও পুড়ে ছাই হয়ে গেলো। গুদামেরও ক্ষতি হলো, যতখানি হবার নয়।

পরে ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেলে ধনী ব্যবসায়ী রাগে ক্ষোভে

উত্তেজিত হয়ে চাকরকে মারতে উদ্যত হলেন। চাকর ছেলেটি বললো, আমিতো আগেই বলেছি, আমি বছরে একটা মিথ্যা কথা বলে থাকি। ধনী লোকটি তখন কপালে হাত চাপড়াতে চাপড়াতে বললোঃ হায় আমি কেন মিথ্যাবাদীকে আশ্রয় দিলাম। আমি কেন সত্যবাদী ছেলেটিকে রাখলাম না। তা হলে কি এই সর্বনাশ ঘটতো!

(নিজস্ব)

ভালবাসা সুরভিত প্রাণ

আজ তোমাদের একজন গায়কের গল্প শোনাবো। গল্প--তবে ঘটনাগুলো ষোলো আনাই সত্য। আমি আজ যার কথা বলবো, তিনি গায়ক হিসেবে যেমন ছিলেন বড় মাপের, তেমন মানুষ হিসেবেও ছিলেন অনেক বড়।

তিনি মিষ্টিকন্ঠে গান গেয়ে একদিন সারা বাংলার মানুষের মন জয় করেছিলেন। এই সুর শিল্পীর নাম আব্বাস উদ্দীন। তিনি যে কেবল গান গেয়েই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন তা নয়, বাংলার ঘরে ঘরে ইসলামী সঙ্গীত ও পল্লীগীতির জনপ্রিয়তা তিনিই সৃষ্টি করেছিলেন। কাজী নজরুল ইসলাম তখন প্রধানতঃ আধুনিক সঙ্গীত রচনা করতেন। আব্বাস উদ্দীন দেখলেন, বাংলার বেশীর ভাগ মানুষ মুসলমান; তারা ধর্ম বিরোধী মনে করে গান শুনছেনা। তিনি ভাবলেন, বাংলার মুসলমানরা ইসলামী সংগীত শুনতে রাজী হবে। তিনি গ্রামোফোন কোম্পানীকে ইসলামী সঙ্গীত প্রচারে রাজী করালেন। ইসলামী সঙ্গীত লিখতে রাজী করালেন কাজী নজরুল ইসলামকে। আব্বাস উদ্দীন না হলে নজরুলের হাত দিয়ে ইসলামী সঙ্গীত বেরুতোনা। আমরা শুনতে পেতাম না এত সুন্দর সুন্দর ইসলামী সঙ্গীত। আব্বাস উদ্দীন নিজেই এসব সঙ্গীত গেয়ে ঘরে ঘরে জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

এবারে যে গল্পটি বলতে চেয়েছিলাম, তাই শুরু করি।

ফরিদপুরের একটি বাড়িতে গ্রামোফোনের রেকর্ডে আব্বাস উদ্দীনের গান বাজছে। অন্য দশজনের সঙ্গে গান শুনছেন কবি জসীম উদ্দীন। তখন কিছু কিছু কবিতা তাঁর প্রকাশিত হয়েছে। গ্রামের লোকজন তাঁকে কবি বলেই ডাকে। কবি জসীম উদ্দীন গান শুনে মুগ্ধ হলেন। অবেগভরা কন্ঠে জিজ্ঞেস

করলেনঃ কে এই গায়ক? জানা গেলো, এই গায়কের নাম আব্বাসউদ্দীন।

তরুন কবি জসীম উদ্দীন কিছু কিছু গানও লিখেছিলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন, তাঁর গানগুলো যদি আব্বাস উদ্দীন গাইতেন, নিশ্চয়ই বাংলার মানুষের কাছে কদর পওয়া যেতো।

জসীম উদ্দীন সুযোগ পেয়ে গেলেন একদিন। তিনি গেলেন কলকাতা। খুঁজলেন আব্বাস উদ্দীনকে। একদিন ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে গানের জলসায় গান গাইতে এলেন আব্বাসউদ্দীন। তরুণ কবি জসীমউদ্দীন খোঁজ নিয়ে আগেই সেখানে গিয়ে

হাজির হলেন। গানের জলসা শেষ হলে বেরিয়ে এলেন আব্বাসউদ্দীন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন কবি গোলাম মোস্তফা। কবি জসীমউদ্দীন এগিয়ে গেলেন আব্বাসউদ্দীনের দিকে। গোলাম মোস্তফার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল আগে থেকেই। ভরসা পেলেন জসীমউদ্দীন। গোলাম মোস্তফা জসীমকে দেখিয়ে আব্বাসউদ্দীনকে বললেনঃ এর নাম জসীম উদ্দীন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। ভাল কবিতা লেখে। অনেক গানও লিখেছে।

আব্বাসউদ্দীন কবি জসীমের পরিচয় জান লেন। তাঁর বাড়ি-ঘরের খোঁজ খবর নিলেন। আগ্রহের সঙ্গে নানা অলাপ আলোচনা করলেন। জসীমউদ্দীন জানালেন, আব্বাসউদ্দীনের গান তার প্রাণ কেড়ে নেয়। তিনি নিজে গান লেখেন, রেকর্ড করাতে চান। আব্বাসউদ্দীন ভারী খুশী হলেন জসীমউদ্দীনের পরিচয় পেয়ে। কিন্তু মন খুলে বেশীক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। দেশের বাড়ি কুচবিহারের ট্রেন ধরতে হবে তাঁকে। তাই তিনি তাড়াতাড়ি চলে গেলেন স্টেশনে।

কিছুদিন পরের কথা। জসীমউদ্দিনের এম. এ. পরীক্ষা শেষ

হয়ে গেছে। ফরিদপুরে গ্রামের বাড়ি বসে ভাবছেন নানা কথা। ভাবছেন, গানগুলো রেকর্ড করানোর কথা। অনেক ভেবে চিন্তে তিনি চিঠি লিখলেন আব্বাসউদ্দীনকে। চিঠির উত্তর এলো। আব্বাস কোলকাতায় যাওয়ার জন্যে চিঠি লিখেছেন জসীমকে। কবির আনন্দ দেখে কে? তিনি উঠলেন গিয়ে আব্বাসউদ্দীনের আস্তানায়। ভাড়া করা ছোট্ট একটা কামরা। সেখানে থাকেন আব্বাসউদ্দীন আর গোলাম মোস্তাফা। এখন এসে জুটলেন জসীমউদ্দীন। দু'জনের চৌকির মাঝখানে সামান্যই জায়গা আছে। সেখানে চৌকি পড়লো জসীমের। বাংলার তিন ভাবী মনীষী আব্বাস, মোস্তাফা, জসীম ঠাসাঠাসি করে বাস করতে লাগলেন সেই ছোট্ট কামরায়।

আব্বাসউদ্দীন ছিলেন এমন একজন মহৎপ্রাণ, যিনি সামান্য স্থান থেকে কিছুটা ছেড়ে দিতে দ্বিধা করেননি। না, এখানেই শেষ নয়। তিনি জসীমউদ্দীনের গান নিয়ে অনেক কিছু ভাবলেন। জসীম নতুন কবি। পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক ভাষায় রচিত তাঁর গানগুলো। তখনও এসব গানের প্রচলন হয়নি। তবুও আব্বাস উদ্দীন রেকর্ড কোম্পানীকে জসীমের গান রেকর্ড করার অনুরোধ জানালেন। কোম্পানীর ম্যানেজার বললেনঃ এই গান বাজারে কাটতি হবে না। লোকসান হবে। আব্বাস তাদের সাহস দিলেন। এমন কি চাপ দিলেন, জসীমের গান রেকর্ড করা না হলে, তিনি এই কোম্পানীতে গান গাইবেন না।

আব্বাসউদ্দীনের এই দাবী উপেক্ষা করা কোম্পানীর পক্ষে সম্ভব ছিলনা। তারা প্রথমে রেকর্ড করলেন জসীমউদ্দীনের দু'টি গান। রেকর্ডের এক পিঠে..... গহীন গাঙ্গের নাইয়া.....অপর পিঠে.....আরে ও রঙ্গিলা নায়ের মাঝি। গান দু'টি গাইলেন আব্বাসউদ্দীন নিজেই।

জসীমউদ্দীনের গান সাড়া জাগালো দেশজুড়ে। বাংলার গ্রামে, গঞ্জে, হাটে-বাজারে, মাঠে-প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়লো তাঁর নাম। একে একে আরো রেকর্ড হলো তার গান। গাইলেন আব্বাসউদ্দীন। জসীমউদ্দীন পরিচিত হলেন বাংলার ঘরে ঘরে।

বাংলার দুই মানিক আব্বাসউদ্দীন আর জসীমউদ্দীন। দু'জন থাকেন এক সঙ্গে। জসীম গান রচনা করেন, আব্বাস তা মিষ্টি কণ্ঠে ছড়িয়ে দেন মানুষের ঘরে ঘরে। কিন্তু বন্ধু বলে সব সময়ই দু'জনের মধ্যে গলায় গলায় ভাব থাকতো, এ কথা বলা যায় না। প্রায়ই লেগে যেতো ঠোকাঠুকি। এই ভালতো সেই মন্দ। সকালে গলাগলিতো বিকালে আড়াআড়ি। তাদের মধ্যে প্রায়ই এমন হতো। আসলে, কবি শিল্পীদের মনটাই নরোম-- কোমল। তারা যেমন ভালবাসতে জানেন, তেমন আঘাতও পান সামান্য ব্যাপারে।

এক বারের কথা। কি একটা ব্যাপার নিয়ে আব্বাস ও জসীমের মধ্যে চলছিল আড়াআড়িভাব। বলা যায় অভিমানের পালা। এ সময় পুরনো ঢাকায় জগন্নাথ কলেজে একটা গানের জলসায় দু'জনই দাওয়াত পেলেন। অনুষ্ঠান শুরু হলো। কবি জসীমউদ্দীন আসন নিলেন মঞ্চের সামনে প্রথম সারিতে। আব্বাসউদ্দীনও এলেন। একজন অরেকজনকে দেখলেন, চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

যতবার আড়াআড়ি হয়েছে, আব্বাসই আগে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এবারও আব্বাস ভাবলেন, জসীমের সঙ্গে আড়াআড়িটা তিনিই ভাঙ্গবেন। যা ভাবা তাই কাজ। তিনি সব ব্যবস্থা আগেই করে এসেছিলেন। গানের জলসার এক ফাঁকে গ্রীনরুমে ডাক পড়লো তাঁর। তিনি মেক আপ নিলেন। এক মুখ সাদা দাঁড়ি লাগালেন। মাথাল মাথায় দিলেন। কাঁধে

লাঙ্গল নিলেন। তারপর ঢুকলেন মঞ্চে। গাইলেন জসীমউদ্দীনের সেই জনপ্রিয় গানটি--

"ও বাজান চল যাই, চল মাঠে লাঙ্গল বাইতে..."

গান শেষ হলো। করতালিতে মুখর হয়ে উঠলো সারাটা অনুষ্ঠান।

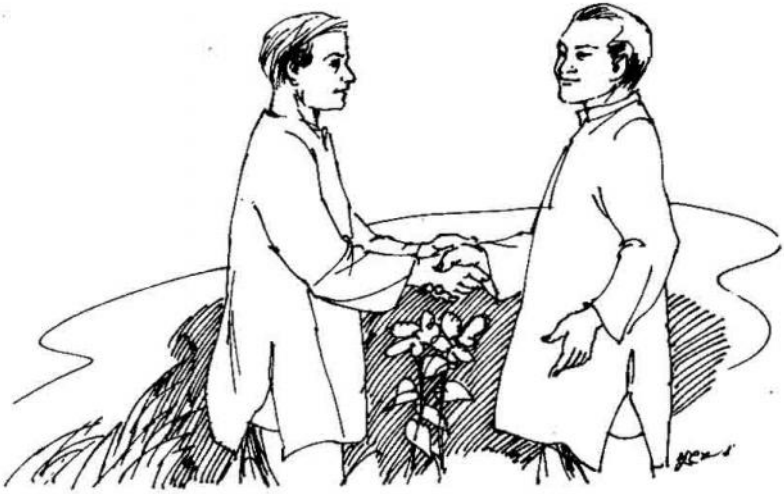

তাকিয়ে দেখলেন কবি জসীমউদ্দীন। তাঁরই লেখা পল্লীগীতি গাইছেন আব্বাসউদ্দীন। গাইছেন বাংলার খাঁটি কৃষক সেজে। প্রাণের সবটুকু দরদ ঢেলে দিয়ে। জসীম উদ্দীন ভাবছেন, এই

কি সেই আব্বাস উদ্দীন, যার সঙ্গে আমার আড়াআড়ি ভাব চলছে, তারপরেও সে বিশাল সমাবেশে গাইছে আমারই রচিত পল্লীগীতি। ভাবনার ফাঁকে জসীমউদ্দীন দেখলেন, তাঁর পাশে এসে বসে পড়েছেন আব্বাসউদ্দীন। কানের কাছে মুখ নিয়ে বলছেনঃ কেমন লাগলো কবি?

জসীম উদ্দীন অভিভূত হলেন। সত্যি, আব্বাসের মত মহৎপ্রাণ আর হয় না। তিনি আব্বাসের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেনঃ এ গানতো কেবল তোমার কণ্ঠেই মানায় বন্ধু।

দুই বন্ধুর অভিমান এ ভাবেই ভেঙ্গে গেলো।

আব্বাস উদ্দীন কেবল একজন বড় মাপের শিল্পীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন মানুষ হিসেবেও অনেক বড়।

সমাপ্ত